গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৮ বর্ষ ২৯ সংখ্যা | ২৭ ফেব্রুয়ারি - ৫ মার্চ ২০২৬ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

কেন অনুদানই ভরসা

পশ্চিমবঙ্গে যখন মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু করে পিএইচডি ডিগ্রিধারী যুব সমাজ 'যুব সাথী' প্রকল্পের লাইনে মাসে ১৫০০ টাকা ভাতার জন্য ফর্ম জমা দেওয়া নিয়ে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে তামিলনাড়ু সরকারের সকলের জন্য বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের তিন বিচারপতির বেঞ্চ প্রশ্ন তুলেছে— ঠিক ভোটের আগে কেন এই সিদ্ধান্ত?

এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ১৯ ফেব্রুয়ারি সমস্ত রাজ্য সরকারের উদ্দেশে মন্তব্য করেছে— আপনারা যদি সকাল থেকে বিনা পয়সায় খাবার, সন্ধ্যায় সাইকেল দিতে শুরু করেন আবার বিনা পয়সায় বিদ্যুৎও দেন, তা হলে কে আর কাজ করবে? অনুদান দিতে গিয়ে রাজ্য সরকারের রাজকোষ ঘাটতি ও ঋণ বৃদ্ধির সমস্যার কথাও তুলেছে আদালত। একই সাথে পরামর্শ দিয়েছে— রাজ্যগুলির উচিত কর্মসংস্থান তৈরির ওপর জোর দেওয়া। বিচারপতিরা বিদ্যালয়, রাস্তাঘাট, পরিকাঠামো, হাসপাতাল ইত্যাদি তৈরিতে সরকারকে খরচ বাড়াতে বলেছেন।

আপাত অর্থে এই কথাগুলির বিরোধিতা বেশিরভাগ মানুষই করবেন না। কিন্তু আরও একটু তলিয়ে ভাবা দরকার, ৭৯ বছরের পুরনো 'গণতান্ত্রিক' ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের ক্ষয়টা কোন স্তরে পৌঁছলে অনুদান বিলিই নির্বাচনে প্রধান ইস্যু হয়ে উঠতে পারে! আরও ভাবা দরকার কেন মানুষের সমর্থনকে সামান্য অনুদানে কিনে নেওয়া সম্ভব হতে পারছে?

ভোটের আগেই এমন নানা প্রকল্প ঘোষণা এখন ভারত জুড়ে খুব স্বাভাবিক ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ৫০০ টাকা করে বৃদ্ধি ও সদ্য চালু হওয়া 'যুব সাথী' প্রকল্প যে ভোটকে সামনে রেখেই, তা মানুষের কাছে স্পষ্ট। কিছুদিন আগে বিহারে ভোটের ঠিক আগে ঘোষণা হয়েছিল মহিলাদের জন্য ১০ হাজার টাকা দেওয়ার কথা। ভারতের সমস্ত রাজ্যের শাসক এবং তাদের বিরোধীরাও আজ এই কাজে জড়িয়ে। ভোটের সময় এলেই যেন নিলাম ডাকার মতো নানা দলের নেতারা প্রতিশ্রুতির পারদ চড়াতে থাকেন। কিছুদিন আগেই মহারাষ্ট্র এবং দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের সময় এমন প্রতিশ্রুতির প্রতিযোগিতা দেখেছে ভারতবাসী। দিল্লির আপ সরকারের অনুদানকে ব্যঙ্গ করে 'রেউড়ি সংস্কৃতি' বলা প্রধানমন্ত্রীর দল দিল্লিতে অনুদান বাড়িয়েছে। মধ্যপ্রদেশে 'লাডলি বহেন যোজনা', মহারাষ্ট্রে 'মাঝি লেড়কি বহেন যোজনা' ইত্যাদি নামে মহিলাদের অনুদান চালাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে ৮১ কোটির বেশি মানুষের জন্য 'খাদ্য সুরক্ষা' প্রকল্পে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়ার কথা ফলাও করে প্রচার করে। এ দিকে তৃণমূলের অনুদান নিয়ে নানা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাতে বিরোধী দলনেতা বলেছেন, বিজেপি জিতলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হবে মাসে ৩০০০ টাকা! বিজেপির রাজ্য ইস্তাহারে বলা হচ্ছে বেকারদের দেওয়া হবে মাসে ২৫ হাজার টাকা। সিপিএম বলেছে তারাও ক্ষমতায় এলে মহিলাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প চালু রাখবে এবং অনুদান বাড়াবে।

ভর্তুকি ও সরকারি অনুদান

কি নিছক রাজনৈতিক অনুগ্রহ

এ কথা ঠিক, নানা রাজ্যে এবং কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন দলগুলি অনুদানকে মানুষের প্রতি দলের রাজনৈতিক অনুগ্রহ

দুয়ের পাতায় দেখুন

ছত্তিশগড়ে কৃষিবন্ধু-প্রাণীবন্ধুদের বিক্ষোভ

ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে রায়পুরে কৃষিবন্ধু-প্রাণীবন্ধুদের বিক্ষোভ, ১৯ ফেব্রুয়ারি। সংবাদ আটের পাতায়

যুবসাথীর লাইনে উপচে পড়া ভিড়

ভয়ঙ্কর বেকারত্বের দুর্বিষহ ছবি

সম্প্রতি পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রণালয়ের পর্যায়ক্রমিক শ্রমশক্তি জরিপের তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। তা থেকে জানা গেছে দেশে বেকারত্বের হার ৪.৮ শতাংশ এবং আরও অবাক করা তথ্য হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে এই বেকারত্বের হার জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেকটাই কম, ৩.৬ শতাংশ। তারপরও উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ রাজ্যের সর্বত্র যুবসাথীর লাইনে মাধ্যমিক থেকে শুরু করে স্নাতক, স্নাতকোত্তর পিএইচডি এমনকি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সী যুবকদের উপচে পড়া ভিড়। বেকারত্বের সরকারি পরিসংখ্যানের সাথে বাস্তবের ছবির যে কোনও মিল নেই, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য উভয় সরকারই নিয়ম করে ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করে চলেছে যে তাদের সময়ে বেকারত্ব কমেছে। তাই যদি সত্যি হয় তা হলে যুবসাথীর লম্বা লাইনগুলোতে যে বিবর্ণ মুখগুলোর ভিড় দেখা যাচ্ছে, এরা কারা? এরা কি ভিনদেশি নাগরিক? আসলে এরা সকলেই আমাদের সহনাগরিক, এ রাজ্যের শিক্ষিত বেকার, যারা ন্যূনতম গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য একটা চাকরি চায়। কিন্তু সরকার তাদের মুখের উপর ১৫০০ টাকার ভাতা ছুঁড়ে দিয়েছে। তারা ভিড় করেছে শহরের অলিতে গলিতে, বড় রাস্তায়, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায়।

কেউ বলছেন, এই টাকা দিয়ে চাকরির ফর্ম কিনবেন, কেউ বলছেন এই টাকা সংসারের কাজে লাগাবেন। কোথাও পিএইচডি করা যুবক ভাতার ফর্ম তুলতে গিয়ে লজ্জায় মুখ ঢাকছেন। আবার

তিনের পাতায় দেখুন

জনগণ নয়, পুঁজিপতিদের হিতেই

এ আই শীর্ষ সম্মেলন

দিল্লির ভারত মণ্ডপমে ছ'দিন ধরে প্রবল আড়ম্বরে হয়ে গেল কৃত্রিম মেধার চতুর্থ শীর্ষ সম্মেলন তথা এআই সামিট। সম্মেলনের খবরে দিন কয়েক সরগরম হয়ে রইল সংবাদমাধ্যম। থাকবে না-ই বা কেন? আন্তর্জাতিক স্তরের বিশাল এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল বিশ্বের ৬৫টি দেশ। এসেছিলেন ফ্রান্স, ব্রাজিল ইত্যাদি নানা দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা। যোগ দিয়েছিলেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব, আইএমএফ-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রমুখ। উপস্থিত হয়েছিলেন গুগল, ওপেন এআই, মেটা, মাইক্রোসফট, অ্যানথ্রোপিক সহ গোটা বিশ্বের প্রায় সমস্ত খ্যাতনামা এআই কোম্পানিগুলির প্রধানরা। দুনিয়ার প্রথম সারির ধনকুবেরদের অন্যতম বিল গেটস ভারতে এসেছিলেন, কিন্তু কুখ্যাত এপস্টিন কেলেঙ্কারিতে নিজের নাম জড়ানোয়, বিরূপ প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কায় সম্মেলনে পা রাখেননি। সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্তারা তো বটেই, উপস্থিত ছিলেন দেশের দুই প্রধান একচেটিয়া কারবারি আদানি ও আম্বানি ছাড়াও টাটা ইত্যাদির মতো বড় পুঁজির অন্যান্য মালিকরা।

উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গোটা বিশ্বের শীর্ষ এআই কোম্পানিগুলির মালিকদের এবং তাঁদেরই মুনাফার স্বার্থ দেখভাল করেন বিভিন্ন দেশের যে রাষ্ট্রপ্রধানরা, তাঁদের স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, এই সম্মেলন হল 'সর্বজন হিতায়, সর্বজন সুখায়'— অর্থাৎ সকলের কল্যাণের জন্য, সকলের সুখের জন্য। বলেছেন, এই সম্মেলন আসলে এআই-কে মানুষের উন্নতিতে ব্যবহারের লক্ষ্যে। এমনকি এআই ব্যবহারের মূল নীতিগুলির ইংরেজি ভাষান্তরের প্রথম অক্ষরগুলি নিয়ে তিনি তৈরি করেছেন একটি শব্দ— 'মানব' (এমএএনএভি) অর্থাৎ মানুষ।

সত্যিই তো! ভারতের প্রধান দুই একচেটিয়া পুঁজিমালিক গৌতম আদানি ও মুকেশ আম্বানি সহ বিশ্বের প্রথম সারির পুঁজিপতিরা এবং তাঁদের রাজনৈতিক ম্যানেজার হিসাবে নরেন্দ্র মোদি সহ বিভিন্ন দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা যে সম্মেলনে এসে হাজির হয়েছেন, তার প্রধান লক্ষ্য যে আপামর জনসাধারণের 'কল্যাণ সাধন' আর 'সুখ বিধান'— এতে আর আশ্চর্য কী! শ্রমিকের 'কল্যাণে'র জন্যই তো চিরদিন মালিকদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড!

সে যাই হোক, 'মানবকল্যাণ'-এর লক্ষ্যে এই

চারের পাতায় দেখুন

কেন অনুদানই ভরসা

একের পাতার পর

বলে দেখিয়ে ভোট চায়। তামিলনাড়ুতে ছাত্রদের সকালের টিফিন থেকে শুরু করে সস্তায় দুপুরের খাবার, নানা রাজ্যে মহিলাদের বাসে ফ্রি যাতায়াত, প্রায় সব রাজ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ট্যাব-ল্যাপটপ ইত্যাদি বিতরণ এখন খুবই স্বাভাবিক বিষয়। পশ্চিমবঙ্গে কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী ইত্যাদি ছাড়াও রাজ্যের প্রায় ৯৫টি প্রকল্পের মধ্যে আছে ক্লাব অনুদান, পুজো অনুদান, পুরোহিত-মোয়াজ্জেম ভাতার মতো প্রকল্পও। এই শেষোক্ত প্রকল্পগুলি নিশ্চিতরূপেই সংকীর্ণ দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে জনমোহিনী অনুদান। ভোট কেনার জন্য কিছুটা যেন ভিক্ষার মতো ছুঁড়ে দেওয়া এই টাকার বান্ডিল পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে শহরে শাসকদলের ভোট ম্যানেজার তৈরির কাজে লাগে নিঃসন্দেহে। একদল মানুষকে ক্রমাগত অনৈতিক রাস্তায় ঠেলে দিতে এই অনুদান কতটা কার্যকরী তাও সকলেই জানে।

কিন্তু বিদ্যুতে, কৃষিতে ভর্তুকি, নিখরচায় বা সস্তায় খাদ্য, ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার সামগ্রী প্রদান, মহিলাদের জন্য ভাতা, বেকারদের ভাতা, বিনামূল্যে চিকিৎসা, দরিদ্র মানুষদের জন্য নানা প্রকল্পও কি শুধুই রাজনৈতিক অনুগ্রহ বিতরণ? সরকারি কোষাগারের টাকা সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে খরচ করলে তা অনুগ্রহ কেন হবে? মানুষের অধিকারের প্রশ্নটাকে কি এ ভাবে অস্বীকার করা যায়! সংবাদমাধ্যম বলে অনুদানের ধাক্কায় রাজকোষে বিপুল চাপ পড়ছে, সরকার ঋণের জালে জড়াচ্ছে। আদালতও তাই বলেছে। তাঁরা বলেন, এর বদলে শিল্প গড়ার জন্য, পরিকাঠামো গড়ার জন্য এই টাকা উদ্যোগপতিদের দিলে সরকারের ঋণ বাড়লেও দেশের সম্পদ বাড়ত। তাতে উন্নয়ন হত। যুক্তিটা একটু খতিয়ে দেখা দরকার।

বিশ্বে যতদিন সমাজতান্ত্রিক শিবির ছিল ততদিন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের চালকরাও কল্যাণকামী রাষ্ট্র বা 'ওয়েলফেয়ার স্টেট'-এর কথা বলতেন। পুঁজিপতিদের কল্যাণটাই তাঁদের মূল লক্ষ্য হলেও সাধারণ মানুষের জন্যও কিছু অধিকারের কথা, মানুষের হকের পাওনার কথা তাদেরও কিছু কিছু বলতে হত। ১৯৯০-এর পর এই শিবিরের অনুপস্থিতির কালে রাষ্ট্রের কর্তাদের এখন সে দায় আর নেই। এখন সাধারণ মানুষকে সরকার কিছু দিলে তা যেন নিতান্তই দয়ার দান! ১৯৯১ থেকে পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের অনুসারী উদার অর্থনীতির প্রবক্তারা সমস্ত ধরনের ভর্তুকি, সরকারি অনুদান বন্ধ করে দিয়ে সব কিছু বাজারের ওপর ছেড়ে দিতে সওয়াল করে চলেছেন। সাধারণ মানুষের করের টাকায় গড়া বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, খাদ্য সরবরাহ, পানীয় জল, রাস্তাঘাট, সেতু, পরিবহণ সব কিছুকে করে তোলা হচ্ছে পুঁজিপতিদের সম্পত্তি। জনগণের পরিষেবা থেকে ক্রমাগত ভর্তুকির বিলোপ ঘটাচ্ছে। কিন্তু দেখা যায় এতে বাজারের সংকট বেড়ে গিয়ে টান পড়ে পুঁজিপতিদের মুনাফায়। ফলে সাধারণ মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে, তাদের কিছুটা ক্রয়ক্ষমতা ধরে রাখতে কিছু ভর্তুকি ও অনুদান দিতে হয় সরকারকে।

অবশ্য সরকারের দায়িত্বে পরিষেবা, নাকি বাজারই সব, এই বিতর্ক পুঁজিবাদী সমাজে চলেছে বহুকাল। ১৯৩০-এর দশকের মহামন্দার সময় পুঁজিবাদী বাজারের ভয়াবহ সংকট মোকাবিলায় বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ জন মেইনার্ড কেইনস বলেছিলেন, সরকার দরকার হলে এক দলকে দিয়ে গর্ত খোঁড়াক, আর এক দলকে দিয়ে গর্ত বোজাক। এর ফলে মানুষের কিছু ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে, তাতেই কাটবে মন্দা। মন্দা কাটেনি বরং তা দিনে দিনে আরও চেপে বসেছে। ১৯৭০ দশকে মার্কিন অর্থশাস্ত্রবিদ জন রলসের দাওয়াই ছিল, রাষ্ট্র কিছু যুক্তিগ্রাহ্য বন্টন নীতি গ্রহণ করুক, তাতেই এক হাতে বেশি সম্পদ জমা হওয়ার সমস্যা কেটে সংকটমুক্ত হবে পুঁজিবাদ। আর এক মার্কিন অর্থশাস্ত্রবিদ রবার্ট নজিক বলেছিলেন, 'মিনিমাম গভর্নমেন্ট' অর্থাৎ চুক্তি রূপায়নের আইনকানুনের ব্যাপারটা ছাড়া আর বাকি সব কিছু ছেড়ে দিতে হবে বাজারের হাতে। যদিও পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার

সরকার জনগণের পরিষেবা থেকে ক্রমাগত ভরতুকির বিলোপ ঘটাচ্ছে। তাতে বাজারের সংকট বেড়ে গিয়ে টান পড়ে পুঁজিপতিদের মুনাফায়। ফলে সাধারণ মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে, তাদের কিছুটা ক্রয়ক্ষমতা ধরে রাখতে কিছু ভর্তুকি ও অনুদান দিতে হয় সরকারকে।

মারণ রোগটি সারাতে এই সব প্রেসক্রিপশন কাজে লাগার কথা নয়, তা লাগেওনি। এখন আবার মানুষের হাতে কিছু টাকা তুলে দিয়ে ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সওয়াল করছেন টমাস পিকেটি থেকে শুরু করে অমর্ত্য সেন, অভিজিত বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়রা। পুঁজিবাদী শোষণে জর্জরিত সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা সামান্য হলেও ধরে রেখে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাকে পুরোপুরি ভেঙে পড়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই তাঁদের এই আকুতি। যে কারণে পশ্চিমবঙ্গের কন্যাশ্রী নিয়ে উৎসাহ দেখিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ।

সবচেয়ে বেশি অনুদান প্রাপক কারা

অনুদানের জন্যই রাজকোষ ঘাটতি, বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী গত বাজেটে বলেছেন রাজ্যগুলো সব মিলিয়ে ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকার অনুদান দেয়। কেন্দ্রীয় নানা ওয়েলফেয়ার স্কিম ধরে তা মোট ৭ লক্ষ কোটি টাকার কাছে। কিন্তু দেশে সবচেয়ে বেশি অনুদান প্রাপক কারা? কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার বৃহৎ পুঁজি মালিকদের কর্পোরেট কর কমাচ্ছে প্রতি বছর। এর পরেও গত বছর ৪ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি কর্পোরেট কর সরকার মকুব করেছে। এসইজেড, আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেনের জন্য (আইএফএসসি) কোম্পানিদের ১০০ শতাংশ পর্যন্ত কর ছাড় দিয়েছে। গত ৫ বছরে ৬ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকার ঋণ ব্যাঙ্কের খাতা থেকে 'রাইট অফ' করে মুছে দিয়েছে। এর বেশিরভাগটাই নিয়েছিল দেশের ধনকুবেররা। একেবারে বিনা পয়সায় বা এক টাকায় হাজার হাজার একর জমি, বিদ্যুৎ, জল, কয়লা, খনিজ সম্পদ সরকার কর্পোরেট পুঁজিমালিকদের হাতে তুলে দিচ্ছে। মানুষকে অনুদান দিতে কোষাগার ঘাটতি বেড়ে উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে, নাকি কর্পোরেটদের জন্য দান খয়রাতিতেই তা ঘটছে? এটা নাকি 'ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস' (ব্যবসার উপযোগী পরিবেশ)! এগুলি নাকি কর্মসংস্থান বাড়াতে বিনিয়োগ এবং উন্নয়ন! টাটাদের মুনাফা গত অর্থ বছরে ১ লক্ষ ১৩ হাজার কোটি, আম্বানিদের ৮১ হাজার ৩০৯ কোটি, আদানিদের ৪০ হাজার ৫৬৫ কোটি টাকা। মালিকদের এত সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও কি কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি বেড়েছে? সারা দেশে ২ লক্ষ ৪০ হাজারের বেশি কারখানা গত পাঁচ বছরে বন্ধ হয়ে গেছে। ৩৫ হাজার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে লালবাতি জ্বেলেছে। এর মধ্যে প্রথম স্থানে মহারাষ্ট্র (৮৪৭২টি শিল্প বন্ধ), নরেন্দ্র মোদির গুজরাটে বন্ধ ৩১৪৮টি শিল্প। গত ১০ বছরে আরও ৫০ হাজার কারখানা বন্ধের মধ্য দিয়ে ৩ লক্ষ শ্রমিকের কাজ হারানোর কথা সংসদে স্বীকার করেছেন মন্ত্রী জিতনরাম মাঝি (দ্য ওয়্যার ১৯.০৩.২০২৫)। দায়টা তবু সাধারণ মানুষেরই!

কর্মসংস্থান!

সুপ্রিম কোর্ট বলেছে অনুদান না দিয়ে কর্মসংস্থান তৈরি করতে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ সন্দেহ নেই। সাধারণ মানুষ তো বটেই এমনকি নানা দলের নেতা-মন্ত্রীরা যাঁরা মানুষকে অনুদান দিয়ে 'কেনা ভোটার' বানাতে চান তাঁরাও কথাটা অস্বীকার করবেন না। কিন্তু করবে কে? কর্মক্ষম মানুষের মাত্র ৫৬.৭ শতাংশ কোনও কাজ করে। কর্মক্ষম মহিলাদের মাত্র ১৬.৭ শতাংশ কাজ করে (প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো ৪.১১.২০২৫)। যারা কাজ করে সেই শ্রমজীবী মানুষের ৯০ শতাংশই অসংগঠিত বা 'ইনফরমাল' কাজ করে। সংখ্যায় তা প্রায় ৪০কোটি। গিগ শ্রমিক অর্থাৎ অনির্দিষ্ট শর্তে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যার সঠিক হিসাব না থাকলেও তা ১৫ থেকে ২০ কোটির কম নয় (ইন্ডিয়াডাটা ম্যাপ.কম, ০২.০৯.২০২৫)। কর্মসংস্থানের হাল তো এই! কেন্দ্রীয় সরকার নিজে স্থায়ী চাকরি প্রায় তুলে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও সিভিক পুলিশ, পার্শ্বশিক্ষক, চুক্তিভিত্তিক নানা কর্মীরাই এখন সরকারের ভরসা। সিএমআই-এর সমীক্ষা বলছে ভারতে বড় অংশের শ্রমজীবী মানুষের গড় পারিবারিক আয় মাসে মাত্র ৫৬৯৩ টাকা। একেবারে নিচের আয়ের মানুষ মাথাপিছু মাসে মাত্র ৮৪৯ টাকা খরচ করতে সক্ষম। ফলে কে ভোগ্যপণ্য কিনবে? কী করে কলে-কারখানায় উৎপাদন হবে? কী করে কর্মসংস্থান হবে?

অনুদান নয় মানুষ কাজই চায়

বিজেপি সরকার পুঁজিপতিদের চাপে সাধারণ মানুষের জন্য গ্যাস, বিদ্যুৎ, তেল, সার, বীজ ইত্যাদি থেকে ভর্তুকি ছাঁটাই করে সেই টাকা পুঁজিপতিদের দেয় তাদের ব্যবসার মুনাফার জন্য। ক্রমাগত তারা এই কাজ করছে। অন্য দিকে যত তারা মানুষের প্রাপ্য কমায় তত বাড়ে বাজার সংকট। কারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে। তখন আবার মানুষকে অনুদান দিয়ে বাঁচাতে হয়। এটা পুঁজিবাদের এক অদ্ভুত বিষচক্র, যা থেকে তার মুক্তি নেই।

ফলে, পুঁজিপতিদের সেবাদাস দলগুলো নির্বাচনের মুখে কী নিয়ে মানুষের কাছে যাবে? কাজ দিতে পারে না, জিনিসের দাম কমাতে পারে না, তাই অনুদান ছাড়া তাদের বলার কিছু নেই। মহিলাদের দেওয়া অনুদান নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে এখন। রাজ্যে রাজ্যে তাঁরাই নাকি অনুদান পেয়ে সরকারি দলের ভোট ব্যাঙ্কে পরিণত হচ্ছেন বলে প্রচার! তাঁদের এই পরিস্থিতিতে ঠেলে দিচ্ছে কে? পরিবারের সংকটের বোঝা সবচেয়ে বেশি সামলাতে হয় তাঁদেরই। আর্থিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন মহিলাদের হাতে সামান্য কিছু টাকা পৌঁছলেও তা ভোগ্যপণ্য কেনার কাজে লাগতে পারে। কিন্তু বিহারে 'জীবিকা' প্রকল্পে মহিলাদের অনুদান দেওয়ার নাম করে আসলে বেসরকারি সংস্থার থেকে ১০ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছিল। এখন ঋণ শোধ করতে না পেরে বহু মহিলা ঘরবাড়ি ছাড়ছেন (স্বাতী ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮. ১২. ২০২৫)। অনুদানের বদলে মহিলাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির চেষ্টা সরকার করেনি। নিয়মিত বেতন পান মাত্র ৯ শতাংশ মহিলা কর্মী। টেলারিং, জরি, পাট, বিড়ি, তাঁতের কাজ সর্বত্রই মহিলাদের মজুরি ঘণ্টায় ১০থেকে ২৫ টাকা (ওই)।

সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিদের প্রশ্ন ছিল অনুদান দিলে কাজের ইচ্ছে কি আর থাকবে? মানুষ কিন্তু বলে— কাজ তো খুঁজে মরছি, দেবে কে? মহিলা থেকে যুব— সকলেরই বলা দরকার, আমরা ভাতাজীবী নয়, শ্রমজীবীই থাকতে চাই। সরকার হয় কাজ দাও, না হলে তার সমান উপযুক্ত ভাতা দাও। এ আমাদের হকের পাওনা। কারও দয়ার দান নয়। জোর গলায় বলতে হবে ভাতা শাসকরা দিচ্ছে তাদের কাজ দিতে না পারার অপদার্থতায়। কিন্তু এর বিনিময়ে বিবেক কেনার চেষ্টা হলে, তাকে রুখতে হবে। না হলে ক্ষতি খেটে খাওয়া মানুষেরই।

জীবনাবসান

পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপ লোকালে পার্টিকর্মী কমরেড বি এন পাল দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর ৪ ফেব্রুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

১৯৭০-এর দশকে দুর্গাপুর স্টিল প্লান্টের ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টে কর্মরত থাকাকালীন সে সময়ের পার্টি কমরেড প্রয়াত কমরেড সন্টু মুখার্জীর সাহচর্যে ইউনিয়ন এবং এস ইউ সি আই (সি)-র সাথে যুক্ত হন। আশির দশকে সিপিএমের নানা সন্ত্রাস উপেক্ষা করে শ্রমিকদের নানা দাবি দাওয়া নিয়ে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত দুর্গাপুর স্টিল ওয়ার্কার্স কো-অর্ডিনেশন কমিটি ইউনিয়নের নেতৃত্বে আন্দোলন করেন। ডিপার্টমেন্টে লাগাতার তিন দিন ধর্মঘট করেন। সে সময় তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অসুস্থ হওয়ার আগে পর্যন্ত নিয়মিত গণদাবী বিক্রি, বাড়ি বাড়ি প্রচার, দলের তহবিলে অর্থ সংগ্রহ ও মিছিল-মিটিংয়ে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। তাছাড়া বিভিন্ন সামাজিক কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। সিপিএমের অত্যাচারের সময় দলের কর্মীদের জন্য তাঁর বাড়ি ছিল নিরাপদ আশ্রয়। তাঁর পরিবারের প্রত্যেকেই দলের নেতা-কর্মীদের শ্রদ্ধার চোখে দেখেন।

তাঁর জীবনাবসানে দল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল।

কমরেড বি এন পাল লাল সেলাম

মার্ক্সবাদ একটা সুসংহত বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি

জোসেফ স্ট্যালিন

বিশ্বে সবকিছুই গতিশীল, ... জীবন বদলে যায়, উৎপাদিকা শক্তি বিকশিত হয়, পুরনো সম্পর্ক ধসে পড়ে।
—কার্ল মার্ক্স

মার্ক্সবাদ শুধুমাত্র সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব নয়, এ একটা সুসংহত বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি, একটা দার্শনিক প্রণালী যা থেকে মার্ক্সের সর্বহারা সমাজতন্ত্র যুক্তিসংগত ভাবেই এসে যায়। এই দার্শনিক প্রণালীকেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলা হয়।

সুতরাং মার্ক্সবাদকে ব্যাখ্যা করার অর্থ হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকেও ব্যাখ্যা করা।

এই প্রণালীকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলা হয় কেন?

কারণ এর পদ্ধতি দ্বন্দ্বমূলক এবং এর তত্ত্ব বস্তুবাদী।

দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি কী?

বলা হয়, সমাজজীবন অবিরাম গতি ও বিকাশের মধ্যে আছে। এ কথা সত্য, জীবনকে অপরিবর্তনীয় ও অনড় বলে মনে করা ঠিক নয়। জীবন কখনও এক জায়গায় থেমে থাকে না, এ অনন্ত গতিশীলতার পথে ধ্বংস ও সৃষ্টির এক চিরন্তন প্রক্রিয়া। তাই, জীবনের মধ্যে সব সময়ই আছে নতুন ও পুরনো, বিকাশমান ও ক্ষয়িষ্ণু এবং বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবী।

দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি আমাদের বলে, জীবন বাস্তবে যেমন, তেমন করেই তাকে দেখতে। আমরা দেখেছি জীবন অবিরাম গতির মধ্যে আছে, ফলে জীবনকে এই গতিশীলতার মধ্যে রেখেই আমরা বিচার করব এবং জিজ্ঞাসা করব— এই গতি জীবনকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? আমরা দেখেছি, জীবন অবিরাম ধ্বংস ও সৃষ্টির একটা চলমান চিত্র। তাই আমরা জীবনকে অবশ্যই এই ধ্বংস ও সৃষ্টির প্রক্রিয়ার মধ্যে রেখে বিচার করব এবং জানতে চাইব, কী ধ্বংস হচ্ছে, জীবনে কী সৃষ্টি হচ্ছে?

এই জীবন প্রবাহে দিনের পর দিন যা সৃষ্টি হচ্ছে এবং বিকশিত হচ্ছে তা অজেয়। তার অগ্রগতি আটকানো যায় না। তাই উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, শ্রেণি হিসাবে সর্বহারাদের যদি জন্ম হয় এবং দিন দিন তারা যদি বাড়তে থাকে, তা হলে আজ তারা শক্তিতে যত দুর্বল ও সংখ্যায় যত কমই হোক, শেষ পর্যন্ত তারা জয়লাভ করবেই। কেন তারা জয়লাভ করবে? কারণ তারা ক্রমাগত বাড়ছে, শক্তি অর্জন করছে এবং সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। অন্য দিকে, এই জীবন প্রবাহে যা পুরনো হচ্ছে, যা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তা যত বিশাল শক্তির অধিকারী হোক, তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তাই দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, আজ যদি বুর্জোয়াদের পায়ের তলা থেকে ক্রমাগত মাটি সরে যেতে থাকে এবং প্রতি দিন যদি তারা আরও পিছু হটতে থাকে, তা হলে আজ তারা যত শক্তিশালী ও সংখ্যায় যত বেশি হোক শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হবেই। কেন? কারণ শ্রেণি হিসাবে আজ তারা ক্ষয়িষ্ণু, দুর্বল ও পুরনো হয়ে যাচ্ছে এবং তারা আজ জীবনের বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

তাই এ থেকেই দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির অতি পরিচিত এই বক্তব্যের জন্ম হয়েছে,

— বাস্তবে যার অস্তিত্ব আছে অর্থাৎ যা দিনের পর দিন বাড়ছে তা যুক্তিসিদ্ধ এবং যা দিন দিন ক্ষয়ে যাচ্ছে তা যুক্তিহীন এবং শেষ পর্যন্ত তা পরাজিত হবেই।

যেমন গত শতাব্দীর আশির দশকে রাশিয়ার বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা বিরাট বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। নারদনিকরা জোরের সাথে বলেছিল, গ্রাম ও শহরের পেটিবুর্জোয়ারাই প্রধান শক্তি যারা রাশিয়াকে 'মুক্ত' করার দায়িত্ব নিতে পারে। মার্ক্সবাদীরা জিজ্ঞাসা করল— কেন? উত্তরে নারদনিকরা বলল, কারণ গ্রাম ও শহরের পেটি বুর্জোয়ারা এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তা ছাড়া তারা গরিব, দারিদ্রের মধ্যে তারা বাস করে।

এর উত্তরে মার্ক্সবাদীরা বলল, এ কথা সত্য যে এখন গ্রাম ও শহরের পেটিবুর্জোয়ারা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তারা সত্যিই গরিব, কিন্তু এটা কি বিতর্কের বিষয়? পেটিবুর্জোয়ারা অনেক দিন ধরেই সংখ্যাগুরু, কিন্তু এখনও পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণির সাহায্য ছাড়া 'মুক্তি' সংগ্রামে তাদের কোনও উদ্যোগ লক্ষ করা যায়নি। কেন? কারণ শ্রেণি হিসাবে পেটি বুর্জোয়ারা সংখ্যায় আর বাড়ছে না। বরং তারা দিনের পর দিন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণিতে পরিণত হচ্ছে। তা ছাড়া দারিদ্রের প্রশ্ন এখানে নির্ধারক বিষয় নয়, কারণ 'ভবঘুরেরা' তো পেটি বুর্জোয়াদের চেয়ে দরিদ্র, তাই বলে এ কথা কেউ বলবে না যে তারা 'রাশিয়াকে মুক্ত' করার দায়িত্ব নিতে পারে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, কোন শ্রেণি সংখ্যাগরিষ্ঠ বা কোন শ্রেণি দরিদ্রতর এটা মূল বিচার্য বিষয় নয়। মূল প্রশ্ন, কোন শ্রেণি ক্রমাগত শক্তিসঞ্চয় করছে আর কোন শ্রেণি ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে।

যে হেতু সর্বহারারাই হচ্ছে এক মাত্র শ্রেণি যারা নিশ্চিতগতিতে বেড়ে উঠছে এবং শক্তিশালী হচ্ছে, যা সমাজ জীবনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং সমস্ত বিপ্লবী শক্তিগুলিকে তার চারপাশে সমবেত করছে, সেই কারণে এই সর্বহারা শ্রেণিকে আমরা আজকের দিনের আন্দোলনের প্রধান শক্তি হিসাবে গণ্য করব এবং এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে সমাজ প্রগতির এই সংগ্রামকে নিজেদের সংগ্রামে পরিণত করব।

এই ভাবে মার্ক্সবাদীরা উত্তর দিয়েছিল।

মার্ক্সবাদীরা অবশ্যই জীবনকে দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছিল, আর নারদনিকরা যুক্তি করেছিল অধিবিদ্যামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে। তারা সমাজ জীবনকে একটা অনড় বিষয় হিসাবে দেখেছিল।

দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি জীবনের বিকাশকে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে।

... দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি বলে, আন্দোলনের বিবর্তনমূলক ও বিপ্লবাত্মক এই দুই রূপ আছে। যখন প্রগতিশীল শক্তি তাদের দৈনন্দিন আন্দোলনের কর্মসূচি চালিয়ে যেতে থাকে এবং সমাজের পুরনো ব্যবস্থায় ছোটখাটো পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটায় তখন তাকে বলা হয় বিবর্তনমূলক আন্দোলন।

আবার যখন এই প্রগতিশীল শক্তি আদর্শগত দিক থেকে একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সংঘবদ্ধ হয় এবং পুরনো সমাজ ব্যবস্থাকে সমূলে উৎপাটিত করার লক্ষ্যে জীবনের গুণগত পরিবর্তনের জন্য, একটা নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য শত্রু শিবিরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন তাকে বৈপ্লবিক আন্দোলন বলা হয়।

বিবর্তন বিপ্লবের জমি তৈরি করে এবং তার ভিত্তি রচনা করে। বিপ্লব এই ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়াকে পূর্ণতা দেয় এবং তার পরবর্তী কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়।

প্রকৃতিতেও একই রকম প্রক্রিয়া ঘটে। বিজ্ঞানের ইতিহাস দেখিয়ে দেয়, দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-ভিত্তিক। জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে সমাজ বিজ্ঞান, এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা এই ধারণারই স্বীকৃতি পাই যে, এই মহাবিশ্বে কোনও কিছুই শাশ্বত নয়, সব কিছুই পরিবর্তিত হচ্ছে, সব কিছুই বিকশিত হচ্ছে। তাই, প্রকৃতির সমস্ত কিছুকেই তার গতি ও বিকাশের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করতে হবে। এবং এ কথার মানে, দ্বন্দ্বতত্ত্বের মর্মবস্তু বর্তমান দিনের সমস্ত বিজ্ঞানের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।

দ্বন্দ্বতত্ত্বের নিয়ম অনুযায়ী আন্দোলনের রূপ সম্পর্কে এর সিদ্ধান্ত হল, ছোট ছোট পরিমাণগত পরিবর্তন, আগে হোক পরে হোক, তা পরিণতিতে বৃহৎ পরিবর্তন, গুণগত পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যায়। এই নিয়ম একই ভাবে প্রকৃতির পরিবর্তনের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও সমান ভাবে প্রযোজ্য। মেন্ডেলিভের 'মৌলের পর্যায় সারণি" পরিষ্কার ভাবে দেখিয়ে দেয়, প্রকৃতির ইতিহাসে পরিমাণগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গুণগত পরিবর্তনের উদ্ভব কত গুরুত্বপূর্ণ।

('নৈরাজ্যবাদ না সমাজতন্ত্র' বই থেকে)

বেকারত্বের দুর্বিষহ ছবি

একের পাতার পর

কোথাও বি টেক পাস করেও চাকরি না পাওয়া ছেলের জন্য ভাতার ফর্ম নিতে এসে কেঁদে ফেলছেন মা। ফর্ম নেওয়ার জন্য মহিলা ও যুবকদের মধ্যে হুড়োহুড়িতে কোথাও কোথাও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছে। দিনভর টিভির পর্দায় আমরা সকলেই এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছি। দারিদ্র, বেকারত্বের কী ভয়ঙ্কর ছবি!

দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত তেল ও গ্যাস কোম্পানি, রেল, বিএসএনএল সহ বহু দপ্তরে কোথাও নিয়োগ শূন্যতে নেমেছে, আবার কোথাও নিয়োগ হচ্ছে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। যেটুকু নিয়োগ হচ্ছে, তার একটা বড় অংশ অস্থায়ী চুক্তির ভিত্তিতে। ইতিমধ্যে বিলগ্নিকরণ ও বেসরকারিকরণের মাধ্যমে বহু রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে বেসরকারি মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের নেশায় সেখানেও চলছে দেদার ছাঁটাই। ইস্পাত, খনি থেকে শুরু করে সিমেন্ট, সারের মতো ভারী শিল্প ক্ষেত্রে নিয়োগ এক রকম নেই বললেই চলে, ছাঁটাই হচ্ছে নিয়ম করে। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পেও মন্দা, ছাঁটাই লেগে আছে। ফলে ভিড় বাড়ছে অসংগঠিত শিল্প ক্ষেত্রে, বাড়ছে গিগ কর্মীর সংখ্যা, বাড়ছে বেকারদের আত্মহত্যার সংখ্যা। আবার এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে শ্রমিকদের উপর নেমে আসছে দুর্বিষহ শোষণ নিপীড়ন।

আসলে পুঁজিবাদী অর্থনীতি তার নিজের নিয়মেই বেকার তৈরি করে, বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে শ্রমিককে তার ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করে, তৈরি হয় মালিকের পুঁজির পাহাড়। আবার এই সমস্ত কিছুকে কেন্দ্র করে যখন শ্রমিকদের মধ্যে, বেকারদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় তখন সে তার আজ্ঞাবহ সরকারগুলিকে দিয়ে নানা প্রকল্পের কথা ঘোষণা করে, যাতে অসন্তোষ কিছুটা হলেও প্রশমিত হয়।

দেশের সরকার, রাজ্যের সরকার এই সমস্ত কথা বিলক্ষণ জানে ও বোঝে। তাই কখনও দেশের প্রধানমন্ত্রী সিঙাড়া শিল্পের, কখনও আবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চপ শিল্পের মতো স্বনির্ভর কাজের কথা বলে যুবকদের ভোলানোর চেষ্টা করেন, কখনও একশো দিনের কাজের তত্ত্ব আওড়ান, আবার কখনও ভাতার আশ্রয় নেন। কিন্তু বেকার সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য যা করা দরকার তা করার ইচ্ছা কোনও সরকারেরই নেই।

পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের শেষের দিকে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা পৌঁছেছিল প্রায় এক কোটিতে। বন্ধ হয়েছিল ছোট-বড় ৫৬ হাজার কল-কারখানা। রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের ১৫ বছরের শাসনে বেকারত্বের এই সংখ্যা যে বিপুল পরিমাণে বেড়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রাজ্যের বিভিন্ন সারকারি দপ্তরে— প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক, গ্রুপ-ডি, গ্রুপ-সি, স্বাস্থ্য দপ্তর, পূর্ত দপ্তর, খাদ্য দপ্তর, বন বিভাগ, পুলিশ বিভাগে কয়েক লক্ষ শূন্য পদ থাকলেও নিয়োগ কার্যত নেই বললেই চলে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিয়োগের নামে ব্যাপক দুর্নীতি। এই যখন বাস্তব পরিস্থিতি তখন এই বিপুল সংখ্যক শূন্যপদ পূরণের জন্য স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে যুবসাথী প্রকল্পের নামে যৎকিঞ্চিৎ ভাতা প্রদান শিক্ষিত বেকারদের সাথে এক ধরনের প্রতারণা, নির্ভেজাল ভোট কৌশল।

ধর্মের মোড়কে ‘শ্রম শক্তি নীতি-২০২৫’

‘শ্রমশক্তি নীতি ২০২৫’ সম্পর্কে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ২০ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় ত্রিপুরা হিতসাধনী হলে, এআইইউটিইউসি-র উদ্যোগে। কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিক স্বার্থবিরোধী শ্রমকোডের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের সমস্ত অর্জিত অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের অবাধ শোষণের পথকেই সুগম

করছে। শ্রম ও শ্রমিকদের অধিকারকে গণতান্ত্রিক চেতনায় বিচার না করে ধর্মীয় দৃষ্টিতে বিচার করার মানসিকতা ও প্রক্রিয়া তৈরি করার জন্যই কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার এনেছে শ্রমশক্তি নীতি ২০২৫। শ্রমকোড সম্পর্কে বিভিন্ন স্তরে নানা আলোচনা হলেও এই শ্রমশক্তি নীতি নিয়ে আলোচনা খুব কম হয়েছে। এই আলোচনা সভার আয়োজন তাই শ্রমশক্তি নীতি ২০২৫ সম্পর্কে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে সচেতনতা ও তার শ্রেণিচরিত্র উন্মোচন করতে একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

মূল আলোচক ছিলেন শ্রম দপ্তরের প্রাক্তন আধিকারিক ডঃ কিংশুক সরকার। তিনি দেখান, বর্তমানে সংগঠিত শ্রমিক সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে। শ্রমশক্তির অধিকাংশই আজ অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত। শ্রমশক্তিকে কার্যত শ্রমিক-মালিক প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বহির্ভূত করার প্রচেষ্টায় রত মালিক শ্রেণি। এই ব্যবস্থাকে আইনি স্বীকৃতি দিতেই কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমকোড ও শ্রমশক্তি নীতি ২০২৫ এনেছে। তিনি বলেন, কারখানায় কাজ না পেয়ে আজ শ্রমিক কারখানার বাইরে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে শ্রমিক বাজারে হাজির হচ্ছেন কাজের আশায়। অনেক শ্রমিক তাঁর শ্রমের ক্রেতা না পেয়ে শূন্য হাতে বাড়ি ফিরতে বাধ্য হন। সংগঠিত ক্ষেত্রের বেশিরভাগ কারখানায় আজ উৎপাদন হয় খুবই সামান্য। বিভিন্ন ছোট ছোট উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে তৈরি করে এনে এখানে অ্যাসেম্বলিং তথা জোড়া লাগানো হয় মাত্র। আগে ঠিকাদারদের মাধ্যমে পরিযায়ী শ্রমিকরা অন্য রাজ্যে কাজে যেত। আজ শ্রমিকরা নিজেরাই অন্য জেলা বা রাজ্যে গিয়ে কাজ খুঁজে নেয়। স্বল্প মজুরিতেই শ্রমিকরা কাজ করতে বাধ্য হয়। কৃষিতে প্রায় ৬৫ শতাংশ শ্রমশক্তি নিয়োজিত থাকলেও দেশে জিডিপির মাত্র ১৪ শতাংশ আসে কৃষি থেকে। এর থেকে বোঝা যায় কৃষি শ্রমিকদের মজুরি কত কম। চা বাগানে একজন শ্রমিককে দৈনিক প্রায় ২৪ কেজি পাতা তুলতে হয়। বিনিময়ে মজুরি সর্বাধিক ২৫০ টাকা পেতে পারে। কিন্তু বাগানে গাছের পরিচর্যা যথাযথ না হলে পাতা কোথা থেকে আসবে? বেশিরভাগ বাগানে শ্রমিকদের এই ২৫০ টাকা বেতন থেকেও কম উৎপাদনের জন্য অর্থ কেটে নেওয়া হয়। চা বাগান সংগঠিত শিল্প হওয়া সত্ত্বেও এই তার অবস্থা। এ ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা আশানুরূপ নয়। শ্রমিক বাজারে নতুন একটি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে অ্যাপ বেসড গিগ ওয়ার্কার। আগামী দিনে এই প্রথার মাধ্যমেই দেশে প্রচুর সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত হবে। এই শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ কোনও মালিক থাকবে না অর্থাৎ প্রচলিত ধারণায় যে শ্রমিক মালিক সম্পর্ক যাকে ভিত্তি করে শ্রম আইন বা শ্রমবিধি এর সবগুলোই কার্যত অকার্যকরী হয়ে যাবে। তিনি এই গিগ ওয়ার্কার ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক এবং স্বনিযুক্ত প্রকল্পের শ্রমিকদের সংগঠিত করবার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন শ্রমিকদের উপযুক্ত মজুরি থেকে বঞ্চিত করলে তাদের শ্রমের যথাযথ মূল্য না দিলে কার্যত তীব্র বাজার সংকট সৃষ্টি করা হবে। বাজারের উৎপাদিত পণ্য শ্রমজীবী মানুষই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে বেশি ভোগ করে। ফলে কম মজুরি দেওয়ার জন্য, যে ব্যবস্থার দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি সেই ব্যবস্থা কার্যত বাজারে আরও তীব্র সংকট সৃষ্টি করবে। এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস বলেন, মালিকরা শত চেষ্টা করেও এবং বিভিন্ন কৌশল করেও শ্রমিক আন্দোলন

পাঁচের পাতায় দেখুন

এ আই শীর্ষ সম্মেলন

একের পাতার পর

সম্মেলনে উপস্থিত মালিকরা বিপুল প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, আগামী দু'বছরে এআই-এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতে অন্তত ২০০ কোটি ডলার অর্থাৎ ১৮ হাজার কোটি টাকা লগ্নি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে ভারতের আদানি গোষ্ঠী ঘোষণা করে দিয়েছে যে, ২০৩৫-এর মধ্যে এআই সংক্রান্ত নানা ক্ষেত্রে তারা ১০০ কোটি ডলার অর্থাৎ প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা পুঁজি বিনিয়োগ করতে চলেছে। এ দিকে মুকেশ আম্বানিও সম্মেলন মঞ্চ থেকে ঘোষণা করে দিয়েছেন, এআই-এ সাত বছরের মধ্যে ১০ লক্ষ কোটি টাকা ঢালবে তাঁর কোম্পানি। তাঁদের লক্ষ্য নাকি প্রতিটি পরিবারে কম খরচে উন্নত মানের এআই পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। শুনলেই মনে পড়ে যায়, ঠিক এমন করেই তাঁদের 'রিলায়্যান্স জিয়ো' প্রায় বিনা পয়সায় মানুষের হাতে ইন্টারনেট পরিষেবা তুলে দেওয়া শুরু করেছিল, যে পরিষেবার দাম বাড়তে বাড়তে ইতিমধ্যেই প্রায় গলা-কাটার স্তরে পৌঁছে গেছে। এ সবই নাকি তাঁরা করেছেন সর্বসাধারণের কল্যাণ ও সুখের ব্যবস্থা করতেই! আম্বানি ও আদানি গোষ্ঠী ছাড়াও ভারতের আরও কয়েকটি পুঁজি গোষ্ঠী নানা বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে এআই উদ্যোগে পুঁজি ঢালার ব্যবস্থা করে নিয়েছে এই সম্মেলন থেকে।

এ দিকে দিল্লির শীর্ষ সম্মেলনে দেশি-বিদেশি কোম্পানির কর্তাদের মুখে যখন সাফল্যের চওড়া হাসি, তখন খবরের কাগজের এক কোণে পড়ে থাকা একটি রিপোর্ট জানাচ্ছে, সরকারি হিসাবেই গত ডিসেম্বরের তুলনায় এ বছরের জানুয়ারিতে দেশে বেকারত্বের হার বেড়ে গেছে। যদিও এ রিপোর্ট শুধুই সংগঠিত ক্ষেত্রকে ভিত্তি করে, যেখানে কাজ করে দেশের কর্মক্ষম মানুষের অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ। বাস্তবে গোটা দেশের বেকার সমস্যার প্রকৃত চিত্র আজ এতটাই ভয়ানক যে ইদানীং কেন্দ্রীয় সরকার সেই হিসাব প্রকাশ করাই বন্ধ করে দিয়েছে।

সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এআই-এর প্রসার হলে কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সাধারণ মানুষও ভাবতে পারেন, এই যে এআই ক্ষেত্রে বিপুল বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হল, এতে তো বিপুল সংখ্যক মানুষের কাজ হবে। ফলে দেশের বেকার সমস্যার নিশ্চয়ই বেশ খানিকটা সুরাহা হবে। কিন্তু তা যে হওয়ার নয়, দিল্লির সম্মেলনের ভরা হাটেই সেই হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার বা আইএমএফ-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা স্বয়ং। বলেছেন, এআই দেশের আয় বৃদ্ধির হার বাড়াতে পারে, কিন্তু শ্রমের বাজারে এর ভয়ানক প্রভাব সুনামির মতো আছড়ে পড়তে পারে। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন, শ্রমের বাজারে এআই-এর প্রভাবে ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ কর্মীর কাজ হারানোর আশঙ্কা এবং এই ঘটনা ঘটবে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী এআই-এর সাহায্যে বিপুল কর্মসংস্থানের যে কথা শোনালেন, তা শুধু গল্পই।

এমনিতেই ভয়াবহ বেকার সমস্যায় দেশের মানুষ জেরবার। নতুন কল-কারখানা খোলা দূরে থাক, বাজারসংকটের কারণে ক্রেতার অভাব এতটাই মারাত্মক যে পুরনো উৎপাদন সংস্থাগুলিও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একে একে। চলছে ব্যাপক হারে শ্রমিক ছাঁটাই। চড়া মুনাফার লোভে শ্রমিকনির্ভর পদ্ধতির জায়গায় পুঁজিপতিরা বেছে নিচ্ছে প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা। সরকারি, বেসরকারি উভয় সংস্থাগুলিতেই স্থায়ী পদ বলতে গেলে উঠে গেছে। সর্বত্রই চুক্তি শ্রমিকরা আজ ভয়ঙ্কর শোষণের শিকার।

এই অবস্থায় এআই চালু হলে পরিস্থিতি যে অসহনীয় হয়ে উঠবে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে কি? অথচ এআই চালু হলে দেশের বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের উপর তার কী প্রভাব পড়বে, এ নিয়ে দিল্লির সম্মেলনে কোনও আলোচনার প্রয়োজনটুকু পর্যন্ত বোধ করলেন না উদ্যোক্তারা। তাঁরা ব্যস্ত দেশ-বিদেশের কোম্পানিগুলির সঙ্গে যৌথ ভাবে এআই সংক্রান্ত উদ্যোগের ব্যবস্থা করে দিয়ে আদানি-আম্বানিদের আরও মুনাফা লুটের সুযোগ করে দিতে।

'এআই-এর গডফাদার' বলে পরিচিত নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত প্রখ্যাত কম্পিউটার-বিজ্ঞানী জিওফ্রে হিন্টন মন্তব্য করেছিলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই বেকার সমস্যা বাড়িয়ে তোলার পাশাপাশি চড়া মুনাফা লুটের সুযোগ করে দেবে। তিনি আরও বলেছিলেন, ধনীরা শ্রমিকদের বদলে এআই ব্যবহার করে নিজেদের মুনাফা বিপুল বাড়িয়ে নেবে, দেখা দেবে ভয়ঙ্কর বেকার সমস্যা। এর ফলে অল্প কয়েক জন ব্যক্তি আরও ধনী হয়ে উঠবে আর বেশির ভাগ মানুষ হয়ে পড়বে আরও দরিদ্র। বলেছিলেন, 'এটা এআই-এর দোষ নয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাই এর জন্য দায়ী'।

স্বাভাবিক নিয়মেই বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে এআই-এর মতো নানা নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হচ্ছে। কিন্তু অন্যায় শোষণের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকা এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এই সব উন্নত প্রযুক্তি জনসাধারণের প্রয়োজন মেটানো ও কল্যাণের কাজে লাগানোর বদলে একচেটিয়া কারবারিদের মুনাফা লুটের কাজেই ব্যবহার করা হয়। বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের শিক্ষক মার্ক্স এবং এঙ্গেলস দেখিয়েছেন, প্রযুক্তি একদিকে যেমন শ্রমিক ছাঁটাই করে, অন্যদিকে ক্রমাগত শ্রমিকের ওপর কাজের বোঝা বাড়িয়ে যায়। নতুন নতুন প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে মুনাফা লুটের হার ক্রমাগত বাড়িয়ে যেতে না পারলে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় টিকতেও পারে না পুঁজিমালিকরা।

এ দিকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির সরকারে আসীন রাজনৈতিক নেতাদের কাজ নিজের নিজের দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফার স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা, তাদের জন্য মুনাফা লুটের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি করে দেওয়া। দিল্লিতে এআই শীর্ষ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সেই কাজটিই করলেন নরেন্দ্র মোদি সহ সম্মেলনে উপস্থিত নানা দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা। ভয়াবহ বেকারত্বের কোপে গোটা দুনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ খেটে-খাওয়া মানুষদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ছে জেনেও এবং এআই-এর ব্যবহারে বিপুল কর্মসংকোচনে তাদের পণ্যের বাজার আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ার আশঙ্কা সত্ত্বেও সম্মেলনে দেশের বিপুল সংখ্যক কর্মহীন মানুষ ও কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের জীবনে এআই-এর প্রভাব নিয়ে আলোচনাটুকুও করলেন না তাঁরা। শুধু মানুষকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে গেলেন যে এআই-এর ব্যবহার বেকার সমস্যা সৃষ্টি করবে না। সম্মেলনে ব্যাপক জাঁকজমকের ঝলকানির আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চাইলেন কর্মহীন এবং কাজ হারানোর আশঙ্কায় আতঙ্কিত অসংখ্য মানুষের অসহনীয় জীবনযন্ত্রণাকে।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সঠিক নেতৃত্বে জোট বাঁধতে হবে গোটা বিশ্বের খেটে-খাওয়া মানুষকে। দাবি তুলতে হবে, বিজ্ঞানের আশীর্বাদ এআই-কে শোষণের তীক্ষ্ণ হাতিয়ার হিসাবে নয়, মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে। দাবি তুলতে হবে মালিকের মুনাফার স্বার্থে এআই ব্যবহার করে একজন শ্রমিকেরও কাজ কেড়ে নেওয়া চলবে না। দেশে দেশে গড়ে তুলতে হবে সংগঠিত ঐক্যবদ্ধ ও লাগাতার শ্রমিক আন্দোলন।

বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রদেশে বিক্ষোভ

বিদ্যুৎ, পানীয় জল, শিক্ষা, চিকিৎসা পরিষেবার বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রদেশ জুড়ে আন্দোলন গড়ে তুলছে এস ইউ সি আই (সি)। ১৭ ফেব্রুয়ারি দলের পক্ষ থেকে মধ্যপ্রদেশ রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ দিবসের ডাক দেওয়া হয়েছিল। ওই দিন গোয়ালিয়রের কম্পু চৌরাস্তা নেহরু পার্কের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সম্পাদক কমরেড রচনা আগরওয়াল। তিনি বিজেপি নেতাদের বহুল প্রচারিত ‘দেশের সর্বাধিক পরিচ্ছন্ন শহর’ ইন্দোরের পানীয় জলে সংক্রমণে ৩৩ জন মানুষের মৃত্যুর মর্মান্তিক বিষয়টি তুলে ধরে বিজেপি সরকারের ভূমিকার তীব্র প্রতিবাদ জানান। স্মার্ট মিটার, ৯৪ হাজার সরকারি স্কুল বন্ধের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানান জেলা কমিটির সদস্য বীরেন্দ্র শিবহরে। বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে নিউ কমিশনার ও এডিএম-এর কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

নদিয়ায় মিড-ডে মিল কর্মীদের ডেপুটেশন

নদিয়ায় সারা বাংলা মিড-ডে মিল ইউনিয়ন, কল্যাণী ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে মিড-ডে মিল কর্মীদের প্রতি কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের আর্থিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে ১৭ ফেব্রুয়ারি গয়েশপুর পৌরসভায় এক্সিকিউটিভ অফিসারের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

কেন্দ্র ও রাজ্য বাজেটে মিড-ডে মিল কর্মীদের বঞ্চনার প্রতিবাদে বাজেটের কপি পোড়ানো হয়। এক্সিকিউটিভ অফিসার বলেন, বেতন যাতে মাসের প্রথম সপ্তাহে কর্মীরা পান তার জন্য তিনি কার্যকরী ব্যবস্থা নেবেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড শিবানী মজুমদার ও ব্যারাকপুর জেলা সাংগঠনিক কমিটির সদস্য কমরেড করুণ দত্ত।

জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতাকে স্মরণ বাঁকুড়ায়

বাঁকুড়ার চিকিৎসক আন্দোলন ও জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা এবং সামাজিক আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ডাঃ নীলাঞ্জন কুণ্ডু ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১১ ফেব্রুয়ারি রাতে ৭৫ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার বাঁকুড়া জেলা কমিটির সভাপতি ও রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি এবং হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের সহ-সভাপতি। তিনি বাঁকুড়া জেলা শিবদাস ঘোষ মেমোরিয়াল কমিটি এবং স্ট্রাগল কমিটি ফর আরজিকর-এর সভাপতি ছিলেন। তিনি সারা জীবন মেডিকেল এথিক্সের পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন।

১৯ ফেব্রুয়ারি বাঁকুড়া জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অফিসের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় বক্তারা বলেন, ডাঃ নীলাঞ্জন কুণ্ডু তাঁর জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একজন আদর্শ ও জনদরদি চিকিৎসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, জনস্বাস্থ্য আন্দোলন এবং সামাজিক আন্দোলনে বিশেষভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এরকম একজন বিরল চরিত্রের চিকিৎসকের কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক সভায় আলোচিত হয়। বর্তমানে চূড়ান্ত নৈতিকতার সঙ্কটের সময়ে, জনস্বাস্থ্য যখন বিপন্ন, কর্পোরেট পুঁজির চূড়ান্ত মুনাফার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মেডিকেল এথিক্স যখন ভূলুণ্ঠিত, সেই সময়ে তাঁর সংগ্রামময় জীবন, আদর্শ মূল্যবোধকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরি। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবং তাঁর অপূরিত কাজ পূরণ করার উদ্দেশ্যে শহরের বিশিষ্ট জনেদের নিয়ে ‘ডাঃ নীলাঞ্জন কুণ্ডু স্মৃতিরক্ষা সমিতি’ গঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলার স্বনামধন্য ডাঃ অমিতাভ চট্টরাজ, ডাঃ জীতেন ব্যানার্জী, সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস, ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের বাঁকুড়া শাখার সম্পাদক ডাঃ সুদেব সিনহা, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের জেলা সম্পাদক ডাঃ তন্ময় মণ্ডল, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব নদীয়া ইন্দু বিশ্বাস, শিক্ষক রঞ্জিত মাহাতো, সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষ, হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা লক্ষ্মী সরকার এবং ডাঃ নীলাঞ্জন কুণ্ডুর দুই কন্যা ডাঃ নিবেদিতা কুণ্ডু ও ডাঃ সঞ্চয়িতা কুণ্ডু, ভাইপো ডাঃ শ্যামসুন্দর কুণ্ডু লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টারের জেলা সম্পাদক অ্যাডভোকেট পরিতোষ দাস সহ শতাধিক চিকিৎসক নার্স স্বাস্থ্যকর্মী অ্যাডভোকেট শিক্ষক এবং সমাজকর্মী।

ছত্তিশগড়ে সরকারি দপ্তরে আড়াই লক্ষের বেশি শূন্যপদ পূরণের দাবিতে এআইডিওয়াইও-র উদ্যোগে ২০ ফেব্রুয়ারি রায়পুর জেলাশাসক অফিসে বিক্ষোভ হয়। পরে জেলাশাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী, শ্রমমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশে দাবিপত্র পেশ করা হয়।

শ্রম শক্তি নীতি

চারের পাতার পর

দমন করতে পারবে না। সব দেশেই তারা এই চেষ্টা করেছে। কিন্তু সফল হয়নি। ভারতবর্ষের শ্রমিকরা মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন গড়ে তুলবে এবং শেষ পর্যন্ত মালিকি রাজ ধ্বংস করে শ্রমিক রাজ প্রতিষ্ঠা করবেই— এটাই বিজ্ঞান ও ইতিহাস নির্দিষ্ট পথ। তিনি আরও বলেন, শ্রমশক্তি নীতি ভারতের সামন্ত যুগের মনু স্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, নারদ স্মৃতি, শুক্র নীতি ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রকে ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। তাই তারা বলেছেন, ‘শ্রমধর্ম’। এই ‘শ্রম শক্তি নীতি-২০২৫’ চতুঃর্বর্ণের বৈষম্যমূলক নীতির ভিত্তিতে বিচার করা হয়েছে।

আধুনিক সমাজে মালিক-মজুর সম্পর্কের ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। মালিকদের অবাধ শোষণকে আরও ভয়ঙ্কর করার জন্য ধর্মের মোড়ক লাগানো হচ্ছে। ওরা চাইছে যাতে এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন না ওঠে। মানুষ বিনা প্রশ্নে মেনে নেয় উৎপাদন পরিচালনা। ধর্মীয় মোড়কে তৈরি শ্রমশক্তি নীতির বিরুদ্ধে আদর্শগত ও শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলে একে প্রত্যাহার করতে সরকারকে বাধ্য করতে হবে। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অনিন্দ্য রায়চৌধুরী।

রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির রাজ্য সম্মেলন

অসহায়, স্বামী পরিত্যক্তা, তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের সামাজিক সংগঠন রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির প্রথম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৩-১৪ ফেব্রুয়ারি মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে। পশ্চিমবঙ্গের মোট ১৬টি জেলা থেকে মোট ২০৫ জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্য সমাবেশে বহরমপুর রবীন্দ্রসদনে ‘আজও রোকেয়া সাখাওয়াত চর্চার প্রাসঙ্গিকতা’ নিয়ে ছিল আলোচনা সভা। পাঁচ শতাধিক নারী, পুরুষ, বহু বিশিষ্ট বিদ্বজন, ছাত্র-যুব স্বেচ্ছাসেবক ও নির্যাতিতা নারী এই সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। রোকেয়ার জীবনসংগ্রাম এবং শিক্ষা সকলকেই সামাজিক নানা সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াই করে মাথা উঁচু করে বাঁচতে শেখায়। আলোচকদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা পাপিয়া নাগ, অধ্যাপিকা আফরোজা খাতুন, সৌরভ মুখার্জী, অধ্যাপক আবুল হাসনাত, সোমনাথ চক্রবর্তী, অধ্যক্ষা ইন্দ্রাণী বসু প্রমুখ। প্রকাশ্য অধিবেশনে সমিতির মুখপত্র রোকেয়া বিশেষ সংখ্যা ‘মুক্তি’ প্রকাশিত হয়। অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারপার্সন অধ্যাপক খইবর আলি মিঞা বক্তব্য রাখেন।

প্রকাশ্য সমাবেশের পর নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে শহরে মিছিল হয়। পরে ঋত্বিক সদনে প্রতিনিধি অধিবেশন থেকে রাজ্যজুড়ে শক্তিশালী নারী অধিকার আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৪২ জনের একটি কমিটি গঠিত হয়। রাজ্য সভাপতি পাপিয়া নাগ, সম্পাদিকা খাদিজা বানু, সহ সভাপতি অধ্যাপিকা আফরোজা খাতুন, মল্লিকা সরকার সহ ১৬ টি জেলার প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলন পরিচালনা করেন মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদিকা রেবেকা সুলতানা।

পাঠকের মতামত

নররাক্ষস বনাম সমাজতন্ত্র

পৃথিবীর সব আলো সব গান বুঝি ঢেকে যায় আজ অন্ধকারে। সব শিশুর কলরব যদি থেমে যায় সব কান্না যদি জড়ো হয় একসাথে, কে ঠেকাবে? এপস্টিনের ৩০ লক্ষ পাতার স্তূপ থেকে নারী শিশুদের আর্তনাদ উঠে আসছে। বুদ্ধিজীবীদের বিশেষ একটা অংশের কাছে বিশ্বের সবচেয়ে খতরনাক ব্যক্তির নাম জিজ্ঞেস করলে চোখ বন্ধ করে তাঁরা স্ট্যালিনের নাম বলেন। তারই সূত্র ধরে তাঁরা বলেন, সমাজতন্ত্র খুবই খারাপ। কী অপরাধ ছিল স্ট্যালিনের? সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস করার জন্য যে প্রতিবিপ্লবী শক্তি সোভিয়েত রাশিয়াকে ঘিরে ধরেছিল, তার ষড়যন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ট্রায়ালের ব্যবস্থা করেছিলেন স্ট্যালিন। সে ট্রায়াল দেখার জন্য বিশ্বের সাংবাদিকদের আহ্বান করা হয়েছিল। আদালত ছিল প্রকাশ্য— সকলের চোখের সামনে। এই বিচারে যত মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, তার থেকে কয়েকগুণ বেশি মৃত্যু দেখানো হয় বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যগুলোতে। সেই সময় জীবিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, রমাঁ রলাঁর মতো মানুষরা। তাঁরা কেউই এই ট্রায়াল সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেননি।

এ দিকে পুঁজির দাসত্ব করে চলা অমানুষ রাষ্ট্রপ্রধানরা যুদ্ধের পর যুদ্ধে কত কোটি মানুষের প্রাণ নিয়েছে, কত মানুষকে গৃহহারা করেছে তার ইয়ত্তা নেই। বিশ্ব জুড়ে নির্বিচারে শোষণ-লুণ্ঠন চালাতে চালাতেই তারা শোষিত মানুষের মুক্তির দিশারি মার্ক্স, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুং-এর মতো মহান মানুষের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে চলেছে।

এই শতকে একের পর এক যুদ্ধে শিশুদের কান্না দেখে, রক্ত দেখে দুঃখে, ক্ষোভে ফেটে পড়েছি। ভেবেছি যারা যুদ্ধ করে তাদের কষ্ট হয় না! কিন্তু তখন তো জানা ছিল না যুদ্ধের চেয়েও বীভৎস জিনিসের চর্চা এই 'গণতন্ত্রে' হয়।

অবলীলায় লক্ষ লক্ষ শিশু সন্তানকে উদরস্থ করে ফেলে সভ্যতার ভড়ং দেখায় যারা, তাদের কাছে বোমা মেরে শহরের পর শহর উড়িয়ে দেওয়া এমন কী ব্যাপার! শুধুমাত্র ক্ষমতাসীন নেতামন্ত্রীরাই নয়, বিরোধী দলের কর্তাব্যক্তিরা, কোনও দলের বাইরে থাকা অর্থবান অভিনেতা, খেলোয়াড়দের মতো ভুরি ভুরি সম্মানীয় ব্যক্তি এই ঘৃণ্য ব্যবস্থার অংশীদার, এই অসভ্য সমাজের ধারক। মুখে গণতন্ত্রের কথা, নারীমুক্তির কথা, কিন্তু আসলে তাদের কদর্য রূপ যে দেখে মানুষের অন্তঃস্থল পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। মানুষ অবাক হয়ে দেখছেন— এই বিরাট বৈভব, বিশাল প্রতিপত্তির ভিতরে কী ভয়াল কদর্যতা আর নৃশংসতা!

এদের হাতে আজ পৃথিবীর ভালোমন্দের দায়িত্ব আমরা তুলে দিয়েছি। আর আজও পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার গুষ্টি উদ্ধার করে যাচ্ছি। এই সব তথাকথিত লিবারেল প্রোপাগান্ডাকারীরা কেন যে এটা করছেন তা আজ দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। এপস্টিন ফাইলে ৩০ লক্ষ পাতার মধ্যে একটি মাত্র বাক্যই এর জন্য যথেষ্ট— 'ফিদেল কাস্ত্রো মারা গেছেন— আমার এখন অনেক সুযোগ'।

এই একটি মাত্র বাক্য এত কিছু কুৎসিত অন্ধকারের মাঝে এক দিগন্ত প্রসারিত আলোর দিশা। ছোট্ট সমাজতান্ত্রিক কিউবা এইসব নররাক্ষসদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। যেমন করে ঘুম কেড়েছিল ছোট্ট ভিয়েতনাম। হাড় হিম করা অন্ধকারের বুকে সেই ছিল আলোর দিশা। মার্ক্স-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুং-ফিদেল কাস্ত্রো নতুন যুগের পৃথিবীর জন্য সেই আলোর গান গেয়েছিলেন, সৃষ্টি করেছিলেন সেই সমাজ।

শর্মিষ্ঠা বর্মন, যাদবপুর

ভিক্ষাসম ভাতা ও প্রকৃত অধিকার

২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের আগে বর্তমান রাজ্য বাজেটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের বৃদ্ধি এবং মাধ্যমিক পাশ বেকার যুবকদের ভাতা দেওয়া নিয়ে চতুর্দিকে পক্ষ-বিপক্ষ মতের একটা শোরগোল চলছে। সরকারের দেউলিয়া আর্থিক পরিস্থিতির কথা তুলে এর সমালোচনা করেও বিজেপি ও সিপিএম বলেছে যে তারা ক্ষমতায় এলে কোনও প্রকল্পকেই বন্ধ করবে না। কেবল এগুলির অনুদানকে দ্বিগুণ করবে।

একটা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সরকার ভাতা-অনুদান-ভর্তুকি দিতে বাধ্য থাকে কেন? কারণ দেশে-রাজ্যে যখন শিল্প গড়ে তোলার সুযোগ থাকে না, কর্মসংস্থান থাকে না, সাধারণ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে থাকে, কিংবা বন্যা-ভূমিকম্প-খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে মৃত্যু এবং ফসল নষ্ট হয়, সরকার তখন অনুদান-ভর্তুকি দিয়ে থাকে। আর এই ধরনের অনুদান-ভর্তুকি উন্নত কিংবা উন্নয়নশীল সকল দেশ নির্বিশেষেই দেওয়া হয়।

কিন্তু ঘটনা হল বেকার যুবকরা যখন বাঁচার মতো উপযুক্ত ভাতার দাবি রাখে, ছাত্ররা শিক্ষায় ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বলে, রোগীরা স্বাস্থ্য খাতে এবং চিকিৎসা পরিকাঠামোয় বরাদ্দ বৃদ্ধির কথা বলেন, কৃষকেরা ফসলের সহায়ক মূল্যের এবং ঋণ মকুবের দাবি তোলেন, শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরির দাবি করেন তখন কিন্তু এই তথাকথিত জনকল্যাণমূলক সরকার এই ধরনের দাবির প্রতি কোনও কর্ণপাত না করে উল্টে বিরুদ্ধাচরণ করে পুলিশ দিয়ে লাঠিপেটা করে, প্রয়োজনে গুলিও চালায়। ফলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সরকারের এই সামান্য ভাতা-অনুদানে জনগণের প্রয়োজনীয় উপকরণ কেনার সামর্থ্য হয় না।

আর এখানেই প্রশ্ন হল, রাজ্যে তৃণমূল সরকার মানুষের অধিকারের পাওনা কেড়ে নিয়ে কেবলমাত্র তাচ্ছিল্য আকারে ভিক্ষাসম ভাতা দিয়ে মানুষের কতটুকু উপকার করছে? তবে এই ভাতাকে কেন্দ্র করে আবার কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন সরকারি চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে ডিএ নাকি একপ্রকার ভাতা, তাছাড়া প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, বোনাস ইত্যাদিও তো একপ্রকার অনুদানের সমান। কিন্তু সরকার এক দিকে সাধারণ মানুষদের বিক্ষোভ প্রশমিত করতে এবং অন্য দিকে ভোটে জয়ী হতে কখনও কখনও সামান্য কিছু দান-খয়রাত করে। আর শ্রমিক-কর্মচারীদের মূল বেতন ছাড়াও ডিএ, পিএফ, গ্র্যাচুইটি, বোনাস— এগুলি হল বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের অর্জিত অধিকার।

আসল কথা হল জনগণকে মৌলিক অধিকার সহ বিভিন্ন দাবিতে যেমন সরকারের বিরুদ্ধে লড়তে হবে পাশাপাশি অধিকারগুলো পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বেতনের সমপরিমাণ বেকার ভাতা চালু করতে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে প্রয়োজনীয় অনুদান দিতে, কৃষিঋণ মকুব করতে, চাষের সার-বীজ- কীটনাশক সহ বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমাণে ভর্তুকি প্রদান করতে বাধ্য করার চেষ্টা জারি রাখতে হবে।

উৎপল দত্ত, পূর্ব বর্ধমান

কোম্পানি দাবি না করলেও কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর ব্যবস্থা করেছে

বর্তমানে বিদ্যুৎ একটা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। বিদ্যুৎ এক সময় পরিষেবা হিসেবে ছিল। সরকারি উদ্যোগে ন্যায্য দামে তা গ্রাহকদের দেওয়া হত। এখন তা বিপুল লাভের জায়গা। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ডব্লিউবিপিডিসিএল নিট মুনাফা করেছে ৩২৪ কোটি টাকা। তা থেকে রাজ্য সরকারের কাছে জমা পড়েছে ১০৪ কোটি টাকা। সংবাদে প্রকাশ, বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ২০৭ কোটি ৯৯ হাজার টাকার চেক তুলে দিয়েছেন। এই তথ্য দেখাচ্ছে, বিদ্যুৎ মোটেই লোকসানের ক্ষেত্র নয়। বিদ্যুৎ সংস্থাগুলি দাম বাড়ানোর আগে লোকসানের যে কথা ভাসিয়ে দেয়, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। লোকসানের কথা তারা বলে দাম বৃদ্ধিকে যুক্তিসঙ্গত দেখানোর জন্য, যাতে জনগণ তা মেনে নেয়।

অন্য রাজ্যের একটি চিত্র দেওয়া যাক। মহারাষ্ট্রে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি টাটা পাওয়ার ২০২৪ -২৫ অর্থবর্ষের জন্য ১২ শতাংশ দাম বৃদ্ধির আবেদন জানিয়েছিল কমিশনের কাছে। কিন্তু মহারাষ্ট্র বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন নিজেই ২৪ শতাংশ দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। এ তো মেঘ না চাইতেই জল! সরকার না কল্পতরু! সরকার জনগণের এমন ক'টা দাবি মেনেছে? মালিকরা যা চায় সরকার বহু ক্ষেত্রে তার অনেক বেশিই দেয়। কিন্তু জনগণ যা চায়, তার ছিটেফোঁটাও দেয় না। সরকার কার স্বার্থে— এ নিয়ে আলাদা করে আলোচনার আর প্রয়োজন পড়ে না।

বিদ্যুতে লোকসানের কোনও বাস্তব অবস্থা নেই, উপায়ও নেই। কারণ বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এ বণ্টন কোম্পানিগুলোকে ১৬.৫ শতাংশ মুনাফা যুক্ত করেই দাম ঠিক করার সুপারিশ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ হল অন্ন-বস্ত্রের মতো একটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিস। এর চাহিদার কোনও ঘাটতি নেই। বাজার সংকট নেই। রয়েছে নিশ্চিত মুনাফা এবং স্থিতিশীল বাজার। ক্রমবর্ধমান বাজার। এই বাজারে পুঁজিপতিদের ব্যবসা করার বড়ই আশা। সেটা পূরণ করতেই বিদ্যুৎ ক্ষেত্রকে পুরোপুরি বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার।

এ জন্য নিয়ে এসেছে বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল ২০২৫। বেসরকারি মালিকরা যাতে সহজে বিদ্যুৎ বিল আদায় করতে পারে, সে জন্য প্রতিটি গ্রাহকের বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসিয়ে দিতে চাইছে সরকার। গ্রাহক আন্দোলনের চাপে স্মার্ট মিটার বসানো স্থগিত থাকলেও সরকারের লক্ষ্য যাতে দ্রুত বসিয়ে দেওয়া যায়। মালিকপক্ষ স্মার্ট মিটার চাইছে অন্য একটি কারণেও। তা হল এআই চালিত এই মিটারিং ব্যবস্থায় নানা কারচুপি ঘটিয়ে অনেক বেশি টাকা গ্রাহকদের থেকে আদায় করা যায়।

এই বিলে বলা হয়েছে, গত বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর উদ্দেশ্য ছিল, লোডশেডিং-এর হাত থেকে মুক্ত করে ভারতবর্ষে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদাকে সামনে রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা। আর এই বিদ্যুৎ বিল ২০২৫-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, বণ্টন কোম্পানিগুলোর অর্থ বিনিয়োগকে উৎসাহব্যঞ্জক ও সারা বিশ্বে প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য স্বাধীন নিয়ন্ত্রণকারী সংগঠন গড়ে তোলা। এ ভাবেই নাকি ১৯৪৭-এ বিকশিত ভারত গড়ে উঠবে। বিলে বলা হয়েছে, বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে বেসরকারিকরণ করা হয়েছে, যার ফলে বর্তমানে দেশের মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ৫৫ শতাংশের বেশি করছে প্রাইভেট কোম্পানিগুলো, যেমন টাটা, গোয়েঙ্কা, আদানি, আম্বানি, এসার, টোরন্টো, জিন্দালের মতো দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা।

এই বিলে এমনও বলা হয়েছে যে, যদি কোনও বছর কোনও বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি তাদের সে বছরের বিদ্যুতের মাশুল নির্ধারণ করার জন্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কাছে কোনও আবেদন না করে, তা হলেও কমিশন নিজেই সে বছরের ট্যারিফ নির্ধারণ করে দেবে। অর্থাৎ কোম্পানি দাম বাড়াতে না চাইলেও কমিশন নিজেই তাদের দাম বাড়িয়ে তাদের মুনাফা অতিবৃদ্ধির ব্যবস্থা করবে। পুঁজিপতিদের সেবায় এমন কল্পতরু সরকার কটা আছে! জনগণের জন্য এমন কল্পতরু সাজতে কখনও কোনও সরকারকেই কিন্তু দেখা যায় না।

মৃত্যুর পরোয়া না করে শুধু ছুটে চলাই জীবন

যে কোনও মুহূর্তে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে জেনেও ওঁদের ছুটে চলতে হয়। এই অনন্ত ছুটে চলার মাঝে সাময়িক বিরতিরও অবকাশ মেলে না। ওঁরা অনলাইন সংস্থার কর্মী বা গিগ-কর্মী।

একটা অর্ডার ফোনে ভেসে উঠলেই জীবনের পরোয়া না করে বাইক বা সাইকেলে পড়ি কি মরি করে ছুটে দোরে দোরে পণ্য পৌঁছে দেন ওঁরা। মাত্র ১০ মিনিটে ক্রেতার কাছে পণ্য পৌঁছনোর প্রতিযোগিতায় ইতিমধ্যেই দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন বহু গিগকর্মী। অনেক সময়ে পথচারীরাও আহত হন। জোম্যাটো, সুইগি, অ্যামাজন, ফ্লিপকার্টের মতো অনলাইন নির্ভর বিপণন সংস্থা বা ওলা, উবেরের মতো পরিবহণ সংস্থাগুলির কর্মীদের হাল এ রকমই। পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৯-৩০ তে ভারতে এই ধরনের কর্মী সংখ্যা পৌঁছবে ২৩ কোটি ৫০ লক্ষে।

জীবনের পরোয়া না করা কি এতই সহজ! আসলে দুর্ঘটনা হতে পারে, মৃত্যু হতে পারে জেনেও ওঁদের এমন বেপরোয়া ছুটে চলার সিদ্ধান্ত নিতে হয় বাধ্য হয়েই। আর্থিক অনিশ্চয়তা, সরকারি-বেসরকারি চাকরির অভাব, ছাঁটাই এবং চটজলদি কাজে ঢোকার সুযোগ, উচ্চ ডিগ্রি বাধ্যতামূলক না হওয়াই এই কাজে বেকারদের ভিড় বাড়িয়ে তুলছে। আবার গিগ সংস্থাগুলি নিজেদের প্রতিযোগিতার কারণে, কত কম সময়ে অর্ডার জোগান দেওয়া যায় তার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। তার শিকার হন কর্মীরা।

গতিময় আধুনিক জীবনে অনেকেই অনলাইনে অ্যাপনির্ভর নানা সংস্থায় অর্ডার দিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করেন। অ্যাপভিত্তিক এই পরিষেবার চাহিদার অনেকটাই যেহেতু সন্ধ্যে থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বেশি থাকে, সে জন্য অনেক ছাত্র, বেকার যুবক এবং অন্যত্র সামান্য পারিশ্রমিকে কাজ করা শ্রমজীবী মানুষ এই কাজ করে কিছুটা বাড়তি আয়ের চেষ্টা করেন।

একমাত্র উপার্জনকারী বাবার মৃত্যুর পর বেহালার রাহুল সংসারের হাল ধরতে উচ্চশিক্ষার আশা ছেড়ে দিয়ে এই কাজে ঢুকেছেন। কোনও রকমে দিন চলে। চাঁদনি চকের বছর তিরিশের গিগ শ্রমিক নাদিম বলেন, 'দশ মাস আগে এক পথদুর্ঘটনায় তিন মাস কোমায় থাকার সময়েও কোম্পানি থেকে কোনও সাহায্য পাইনি।' পরে কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। 'সাত ঘণ্টা কাজ করে ১১টি অর্ডার সাপ্লাই দিয়ে হাতে পাই মাত্র ২৬৩ টাকা। কখনও কখনও একটানা ১২ ঘণ্টা কাজ করে হয়ত হাজার খানেক টাকা আয় হয়। সংসার চালানো কষ্টকর।' বলেন ডেলিভারি পার্টনার আমন।

'গিগ' শ্রমিক শব্দটিতে বোঝায় সাময়িক ভাবে নিযুক্ত শ্রমিক। এঁরা সবচেয়ে বেশি অরক্ষিত। শ্রমিকের কোনও নিয়ম-বিধি এঁদের ক্ষেত্রে মানা হয় না। তা সত্ত্বেও প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ওঁরা কোম্পানি মালিকদের লাভ নিশ্চিত করেন। নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যে না পৌঁছতে পারলে এক দিকে কোম্পানি-মালিক টাকা কেটে নেয়, অন্য দিকে রাস্তায় ট্রাফিক নিয়মবিধি লঙ্ঘনের দায়ে পুলিশি জরিমানার ভয়ে ত্রস্ত থাকতে হয় এঁদের।

গিগ কর্মী

গত ২৫ ও ৩১ ডিসেম্বর গিগ শ্রমিকরা দেশজোড়া ধর্মঘটে সামিল হন। এঁরা ধর্মঘটের পথে যেতে বাধ্য হলেন কেন? কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত নয়া শ্রমকোডের মাধ্যমে এঁদের ন্যূনতম অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বেতন নেই, সামাজিক সুযোগ-সুবিধা নেই, সুরক্ষা নেই, অতিরিক্ত পরিশ্রমে অসুস্থ হলে বা পথদুর্ঘটনায় আহত হলে চিকিৎসার জন্য কোম্পানি কোনও সাহায্য করে না। অথচ ওঁরাই নাকি বিজনেস পার্টনার! পরিচালকমণ্ডলীতেও ওঁদের কোনও প্রতিনিধি রাখা হয় না। ব্যবসার কোনও লভ্যাংশ ওঁরা পান না, তা হলে ওঁরা কী ভাবে বিজনেস পার্টনার হতে পারেন? আসলে ব্যবসায় অংশীদারিত্বের কথা বলে ওঁদের শ্রমিকের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখার এ এক আধুনিক কৌশল। কারণ 'পার্টনার' না বলে 'কর্মচারী' বললে নিয়ম অনুযায়ী এঁদের ন্যূনতম মজুরি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, স্বাস্থ্যবিমা, পেনশনের সুবিধা দিতে হবে। দিতে হবে ন্যায্য ছুটিও। সে জন্যই এই ফাঁক রাখা। দেশে শপস অ্যান্ড এস্টাবলিশমেন্ট রেজিস্ট্রেশন সংস্থা আছে। মালিকী বঞ্চনার এই কৌশলে প্রচলিত শ্রম আইন বা শ্রমিক সুরক্ষা বিধির কোনও কিছুই এদের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়নি। নতুন শ্রমকোড হওয়ার পর ২০২৫-এর শেষ দিকে অসংগঠিত শ্রমিকরা (এর মধ্যে রয়েছেন গিগ শ্রমিকরা), সামাজিক নিরাপত্তার (সোসাল সিকিউরিটি) আইনি স্বীকৃতি পেয়েছেন। এই প্রথম অসংগঠিত শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ, স্বাস্থ্য বিমা ইত্যাদি আইনি স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। সবই শুকনো ঘোষণা— সেগুলি কার্যকর হয়নি। শ্রমবিধিতে যে বেতন কাঠামোর কথা বলা হয়েছে তা-ও মানা হচ্ছে না। কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় সরকারেরই এঁদের নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই। সাম্প্রতিক রাজ্য বাজেটে এঁদের নিরাপত্তা নিয়ে একটি কথাও নেই।

চরম বঞ্চনার শিকার গিগ শ্রমিকদের সমর্থনে শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি গিগ কর্মীদের স্বচ্ছ, উপযুক্ত ও সুনির্দিষ্ট মজুরি এবং যুক্তিসঙ্গত ইনসেনটিভ চালু করা, যুক্তিসঙ্গত কাজের সময় ও আবশ্যিক বিশ্রামের সুযোগ দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। দাবি তুলেছে, যখন তখন আইডি ব্লক এবং জরিমানা করা বন্ধ করতে হবে। গিগ কর্মচারীদের সম্পূর্ণ সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। স্বাস্থ্য ও দুর্ঘটনা বিমা, পেনশন, কাজের স্থায়িত্ব, কর্মক্ষেত্রে যথাযথ সম্মান দিতে হবে। গিগ শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিগুলির মান্যতা দিয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পুঁজিবাদী এই ব্যবস্থায় তীব্র বাজার সংকটের সময়েও দ্রুত প্রসার বাড়ছে এই সব ক্ষেত্রের। উৎসবের সময় যখন চাহিদা তুঙ্গে থাকে তখন তো বটেই, অন্যান্য সময়েও ব্যাপক হারে লাভ করছে এই কোম্পানিগুলি। অ্যামাজনে ২০২৫-এ মোট লাভ হয়েছে ৭৭.৭ বিলিয়ন ডলার, ২০২৪ থেকে '২৫ সালে মোট মুনাফা বেড়েছে ৩১ শতাংশ। জোম্যাটো গত অক্টোবর-ডিসেম্বরে মোট লাভ করেছে ১২০ কোটি টাকা।

তা হলে উদয়াস্ত খেটে যে শ্রমিকরা লাভের কড়ি মালিকের ঘরে তুলছে, জীবন বিপন্ন করে মালিকের লাভ বাড়িয়ে তুলছে, তাদের প্রতি এত অবহেলা কেন? কারণ সরকারি আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি এমন করেই তৈরি করা যাতে কোম্পানি-মালিকরা যতই শ্রমিক-শোষণ করুক, তাদের শাস্তির মুখে পড়তে না হয়, গোটা অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা এবং সবচেয়ে নিষ্পেষিত গিগ শ্রমিকরা ইউনিয়ন করে মালিকের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করার সুযোগ না পান। গোটা রাষ্ট্রযন্ত্র— পুলিশ-প্রশাসন, এমনকি বিচারবিভাগ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ভাবে বা পরোক্ষে মালিকদের পক্ষ নেয়। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি গৃহপরিচারিকা সম্পর্কিত এক রায়ে বলেছেন, ঝাণ্ডাধারীদের জন্যই বেশ কিছু শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। ওই বিচারপতির এই বক্তব্য আদৌ সত্য নয়। সরকারগুলিও শ্রমিক অধিকার রক্ষার বিরুদ্ধে এক সুরে কথা বলে।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি শ্রমিক স্বার্থবিরোধী শ্রমকোড বাতিলের দাবিতে ১০টি বামপন্থী কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের আহ্বানে ধর্মঘটে শ্রমিকরা যখন একজোট, তখন দেখা গেল ধর্মঘটের বিরুদ্ধে কেন্দ্র-রাজ্যের এক সুর। মুখে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করা রাজ্য সরকার কর্মচারীদের উদ্দেশে 'ধর্মঘটে যোগ দিলে ব্যবস্থা নেওয়ার' নোটিস জারি করল। আশাকর্মী ও পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের ধর্মঘটের বিরুদ্ধেও কেন্দ্র-রাজ্যের এই ঐক্য দেখা গিয়েছিল। আসলে সরকারগুলি খোলাখুলি মালিক শ্রেণির সেবা করছে, তারা কেউই শ্রমিকের স্বার্থ দেখে না। বহু হইচই হওয়ার পরে সম্প্রতি ই-কমার্স সংস্থা ব্লিঙ্কিটকে দশ মিনিটের মধ্যে ডেলিভারি দেওয়ার ফতোয়া প্রত্যাহার করে নিতে বললেও শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করেনি। ফলে দ্রুত পরিষেবা দিতে গিয়ে কত গিগ-শ্রমিকের মৃত্যু হল, কত পরিবার পথে বসল, বেপরোয়া বাইক চালানোয় কত পথচারী বিপদগ্রস্ত হল, তার খোঁজ কোম্পানি বা সরকার রাখে না, রাখতে চায় না।

এটাই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার নিয়ম। এই অর্থব্যবস্থায় এটাই শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ। অসহনীয় এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি কোন পথে শ্রমিকদের আজ তা খুঁজে বের করতেই হবে।

সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে ওষুধ জোগানোর দাবি

এসইউসিআই(সি) দলের কর্ণাটক রাজ্য সম্পাদক কমরেড কে উমা রাজ্যে সরকারি হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ওষুধের ঘাটতি প্রসঙ্গে ১৯ ফেব্রুয়ারি এক প্রেস বিবৃতি দেন।

তিনি বলেন, সরকারি হাসপাতালে এমন অবস্থা হয়েছে যে বর্হিবিভাগের রোগীদের সাধারণ জ্বর, সর্দি-কাশি, ডায়রিয়া ও প্রেসারের সমস্যার জন্য বাইরে থেকে ওষুধ কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে। এমন খবরও বেরিয়েছে যে, প্রয়োজনীয় ওষুধ ও সরঞ্জামের অভাবে রোগীদের অপারেশন পর্যন্ত বন্ধ থাকছে। কিছুদিন আগেও স্বাস্থ্য দপ্তর নিজেদের তৈরি ওষুধ জেলায় জেলায় প্রয়োজনমতো বিনামূল্যে সরবরাহ করত। কেন্দ্রের বিজেপি ও রাজ্যের কংগ্রেস যৌথভাবে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে 'আয়ুষ্মান ভারত-আরোগ্য কর্ণাটক' নামে একটি প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পের বরাদ্দ থেকে প্রতিটি হাসপাতালকে নিজেদের প্রয়োজনীয় ওষুধ আলাদা করে কিনতে হচ্ছে। ফলে গরিব, মধ্যবিত্ত মানুষ যারা সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে বাধ্য হন, তারা পরিষেবা পেতে বেসরকারি হাসপাতালে ছুটতে বাধ্য হচ্ছেন। এটা স্বাস্থ্যক্ষেত্রের বেসরকারিকরণই ঘটাবে। তিনি বলেন, সরকারের মনে রাখা উচিত জনগণকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া তাদের ন্যূনতম দায়িত্ব। জনগণের দাবি মেনে সরকারকে সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে।

স্বরূপনগরে শ্রমিক সভা

১৫ ফেব্রুয়ারি উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগরের তেঁতুলিয়া গার্লস হাইস্কুলে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত আশা, মিড-ডে মিল, নির্মাণ, বিড়ি, দর্জি, কর্মবন্ধু, মোটরভ্যান, টোটো, পরিযায়ী ইত্যাদি ক্ষেত্রের অগ্রগামী শ্রমিকদের উপস্থিতিতে আয়োজিত হল শ্রমিক সভা। শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণিচেতনার মানোন্নয়নকল্পে আয়োজিত এই সভায় মূল আলোচক ছিলেন রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস।

এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জয়ন্ত সাহা, আশাকর্মী সংগঠনের পক্ষে মিতালী চক্রবর্তী ও অঞ্জনা মণ্ডল, মিড-ডে মিল সংগঠনের পক্ষে তুলসী সরকার, টোটো চালক সংগঠনের পক্ষে গৌতম ভাবক, বিড়ি শ্রমিক সংগঠনের পক্ষে শিখা রায়, কর্মবন্ধুদের পক্ষে সবিতা দত্ত, পরিযায়ী শ্রমিক সংগঠনের পক্ষে ছোটু মির্জা, নির্মাণ শ্রমিক সংগঠনের পক্ষে অজিত মণ্ডল প্রমুখ।

সভাপতিত্ব করেন ললিতা চৌধুরী। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালনায় ছিলেন বিশিষ্ট শ্রমিক নেত্রী বেলা পাল।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 78, No.: 29 Bengali Weekly February 27, 2026 Kolkata Price: Rs. 3.00

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কনভেনশন বাঙ্গালোরে

নারী শরীরকে আজকের সমাজ পণ্যে পরিণত করেছে— বাঙ্গালোরে নারীদের ওপর সংগঠিত অপরাধ সংক্রান্ত এআইএমএসএস আহুত কনভেনশনে বলে গেলেন কর্ণাটকের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব রামেশ্বরী ভার্মা। ৭ জানুয়ারি গান্ধী ভবনে কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি) কর্ণাটক রাজ্য সম্পাদক কমরেড কে উমা। উদ্বোধনী সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি এম এন মঞ্জুলা। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক এস শোভা, সর্বভারতীয় সহসভাপতি ডাঃ সুধা কামাথ প্রমুখ।

বেলদায় শিশু-কিশোর উৎসব

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৫০তম স্মরণ বার্ষিকী উপলক্ষে কমসোমল পরিচালিত শিশু-কিশোর সম্মিলনী প্রস্তুতি কমিটির পক্ষ থেকে দু'দিনের শিশু-কিশোর উৎসব অনুষ্ঠিত হয় পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদার দেউলি সুধীর হাইস্কুলে। ১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি দেড় শতাধিক শিশু-কিশোর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, নাটক, মূকাভিনয়, পিটি ও দেওয়াল পত্রিকা, পোস্টার লিখন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। দেখানো হয় 'অঙ্ক কি কঠিন' সিনেমা।

সমাপনী সভায় শিশু-কিশোরদের সুস্থ শরীর, সুন্দর মনন গড়ে তোলার লক্ষ্যে আলোচনা করেন এসইউসিআই(সি)-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অনুরূপা দাস। উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সম্পাদক কমরেড তুষার জানা এবং কমসোমল রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির যুগ্ম কনভেনর কমরেড শুভেন্দু মণ্ডল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বক্তারা কৈশোরকে প্রস্ফুটিত করে যথার্থ মানুষে বিকশিত হওয়ার জন্য এ দেশের মনীষী ও বিপ্লবীদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের গড়ে তোলার আহ্বান জানান। মোবাইল ও অপসংস্কৃতির বিপরীতে এমন চর্চা-প্রসারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

'শিশু-কিশোর সম্মিলনী, পশ্চিম মেদিনীপুর দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা কমিটি' গঠিত হয়। কুমকুম জানা ও শুভঙ্কর ঘাঁটিকে যুগ্ম সম্পাদক করে ১৯ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের ওপর কর্তৃপক্ষের হামলা

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত ধরনের সমাবেশ নিষিদ্ধ করেছে কর্তৃপক্ষ। ১৭ ফেব্রুয়ারি জারি করা এই অগণতান্ত্রিক ফরমানে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক মাসের জন্য সকল ধরনের জনসমাবেশ এবং সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে ১৯ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস ফ্যাকাল্টির গেটে এআইডিএসও এবং আরও দুটি বাম ছাত্র সংগঠন সাংবাদিক সম্মেলনের আহ্বান জানিয়েছিল।

ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আবেদন জানাতে ও সাংবাদিকদের সামনে বক্তব্য রাখতে জড়ো হতেই রক্ষীরা তাদের ঘিরে ফেলে। পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হয়, আয়োজকদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণ ছাত্রদের স্থানটি খালি করার হুমকি দেওয়া হয়। রক্ষীরা সাংবাদিকদের ছবি তোলাতেও বাধা দেয়। রক্ষীরা জোর করে শিক্ষার্থীদের আর্টস ফ্যাকাল্টির গেট থেকে দূরে ঠেলে দিলে সংবাদ সম্মেলনটি বিক্ষোভে পরিণত হয়।

এআইডিএসও-র বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিট ইনচার্জ অদ্রিকা বলেন, এই ফরমান কেবল অগণতান্ত্রিকই নয়, শিক্ষার মূলনীতির উপর সরাসরি আক্রমণ। এর লক্ষ্য ক্যাম্পাসে সকল ধরনের বিতর্ক, আলোচনা এবং সুস্থ সংলাপকে স্তব্ধ করে দেওয়া। আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানাচ্ছি যে, এই আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হোক। না হলে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে তাদের ন্যায্য গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলন জোরদার করবে।

তেলের গুড় রিলায়েন্সে খায়

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে মন্ত্রী মহোদয়রা বলে চলেছেন, আমদানি শুল্ক তুলে নেওয়ার ফলে দেশের মানুষ আমেরিকা থেকে আমদানি করা দ্রব্য সস্তায় পাবে। সত্যিই কি পাবে?

গত কয়েক বছর ধরে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম যখন খুবই চড়া, ইউক্রেন যুদ্ধের সুযোগে ভারতীয় তেল কোম্পানিগুলি ব্যাপক কম দামে তেল আমদানি করেছে রাশিয়া থেকে। তাতে কি দেশে তেলের দাম সস্তা হয়েছে? জনসাধারণ কম দামে তেল পেয়েছে? তথ্য বলে, একেবারেই না। দেশীয় বাজারে তেলের দাম এক পয়সাও কমেনি। বাস্তবে তেল কোম্পানিগুলো সস্তায় কেনা অপরিশোধিত তেল পরিশোধন করে ইউরোপের বাজারে আন্তর্জাতিক বাজারের দামে বিক্রি করেছে। ফলে মুনাফায় লাল হয়ে উঠেছে দেশীয় তেল কোম্পানিগুলি। তাতে সাধারণ মানুষের কী লাভ হয়েছে?

এই অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে রাষ্ট্রায়ত্ত ইন্ডিয়ান অয়েলের লাভ ৩২২ শতাংশ বেড়ে পৌঁছেছে ১২,১২৬ কোটি টাকায়। ৬২ শতাংশ বেড়ে ভারত পেট্রোলিয়ামের নিট মুনাফা হয়েছে ৭,৫৪৫ কোটি টাকা। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ নিট মুনাফা করেছে ২২,২৯০ কোটি টাকা।

আবার ট্রাম্পের হুমকিতে রাশিয়ার তেল আমদানি বন্ধ করে ভারত যদি অনেক বেশি দাম দিয়ে, অনেক বেশি পরিবহণ খরচ দিয়ে আমেরিকা এবং ভেনেজুয়েলার তেল আমদানি করে, তখনই তেলমন্ত্রী থেকে শুরু করে সব তেল কোম্পানি ক্ষতির গাওনা গেয়ে দেশীয় বাজারে জনগণের উপর বাড়তি দাম চাপাবে। আর তেল কোম্পানিগুলি মুনাফার চূড়ায় বসে সরকারের নামে জয়ধ্বনি দেবে! দেশ শাসনের নামে এই ট্র্যাডিশনই চলছে। (সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬)

জনগণের জন্য চড়া সুদ, পুঁজিপতিদের ঋণ মকুব

হয় কথায় নয় কথায় গ্রাহকদের থেকে জরিমানা আদায় করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি। অবিশ্বাস্য মনে হলেও, গত পাঁচ বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি প্রায় ১৭,২৫১ কোটি টাকা এই ভাবে আদায় করেছে। অন্য দিকে একচেটিয়া পুঁজির মালিকদের দেদার ঋণ মকুব করে চলেছে ব্যাঙ্কগুলি। গত ৫ বছরে ধনীদের মোট ৬.১৫ লক্ষ কোটি টাকার বেশি ঋণ মকুব করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি। শুধু স্টেট ব্যাঙ্কই গত এক দশকে মকুব করেছে ২ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ।

অন্য দিকে গত অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে স্টেট ব্যাঙ্কের নিট লাভ হয়েছে ২১,০২৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের বুকে হাঁটু দিয়ে চড়া সুদ আদায় করো, আর সেই টাকায় পুঁজিপতিদের ঋণ মকুব করো— এই হল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের নীতি। জনগণের স্বার্থ রক্ষাই বটে! (সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬)

কৃষিবন্ধু-প্রাণীবন্ধুদের বিক্ষোভ ছত্তিশগড়ে

ছত্তিশগড়ের কৃষিবন্ধু এবং প্রাণীবন্ধুরা চূড়ান্ত সরকারি বঞ্চনার শিকার। তাঁরা মাসে মাত্র ১৯১০ টাকা সাম্মানিক পান। বহু বছর কাজ করা সত্ত্বেও অনেক কর্মীকে জোর করে ছাঁটাই করা হচ্ছে। এর প্রতিবাদে বিহান সক্রিয় মহিলা সংঘ এবং কৃষিবন্ধু প্রাণীবন্ধু সংঘ (এআইইউটিইউসি অনুমোদিত) গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ছত্তিশগড়ের রায়পুরে বিক্ষোভ দেখালে পুলিশ সেই ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে বাধা দেয় এবং জোর করে গাড়িতে তুলে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহিলাকর্মীরা সাহসের সঙ্গে বিক্ষোভ দেখান। বিজেপি সরকারের পুলিশ এই আন্দোলনকে জোর করে ভাঙার চেষ্টা করে। এমনকি বিক্ষোভের পরে পাশের একটি পার্কে কর্মীরা যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, সেখানেও পুলিশ হামলা চালায়।

পুলিশের এই বর্বর আক্রমণের প্রতিবাদে এবং সাম্মানিক ভাতা মাসে ন্যূনতম ৬ হাজার টাকা, অন্যায় ছাঁটাই বন্ধ করা সহ বিভিন্ন দাবিতে ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে দাবি না মানা পর্যন্ত সংগঠনের পক্ষ থেকে 'কাম বন্ধ, কলম বন্ধ হরতাল'-এর ডাক দেওয়া হয়েছে এবং বিধায়ক ঘেরাওয়ের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সক্রিয় মহিলা সংঘের সভানেত্রী পদ্মা পাটিল, সম্পাদিকা বিন্দু যাদব, কৃষিবন্ধু-প্রাণীবন্ধু সঙ্ঘের সভানেত্রী ঐশ্বর্যা রায় এবং সম্পাদিকা রামেশ্বরী রাজপুত।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com